স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

৬৭ বর্ষ, ৫ সংখ্যা
১৫ সেপ্টেম্বর : ২০১৪
২৯ ভাদ্র : ১৪২১
website: www.eswastika.com

পরিবেশ বাঁচাও

মোদীর জাপান সফর পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দিগন্তের উন্মোচন

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ২৯ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১৫ সেপ্টেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

দেশের মানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মা-মাটি-সারদা জিন্দাবাদ □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

প্রধানমন্ত্রী মোদীর জাপান সফর সহযোগিতার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন □ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃপ্রাঃ) □ ১২

প্রাচীন ভারতে পরিবেশ ভাবনা □ বিকাশ ঘোষাল □ ১৪

উষ্ণায়ণ, পরিবেশ ও অশনি সঙ্কেত □ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় □ ১৫

কলকাতা শহর কি বিপর্যয়ের দোরগোড়ায়? □ পৃথ্বীরাজ মিত্র □ ১৭

তর্পণ □ অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায় □ ২১

গজশাস্ত্র □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২৩

হিন্দি-জাপানি ভাই-ভাই, আবে ও মোদীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতাই এশিয়া ভূখণ্ডে এক দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের ভিত গড়ল □ ব্রহ্মা চেলানী □ ২৭

এক যুগান্তকারী সংস্কার— প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা □ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী □ ২৯

কেন্দ্রীয় সরকারের একশো দিন, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ৩১

পরিবেশ ও কলকাতার পুকুর □ মোহিত রায় □ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৩-৩৬** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০**

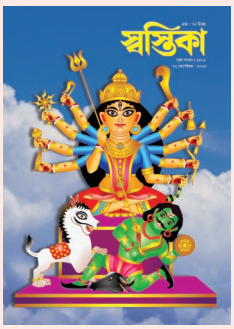

আগামী সংখ্যাই
পূজা সংখ্যা (১৪২১)

প্রকাশিত হচ্ছে ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ ।। মূল্য ৭০ টাকা।।

HB®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

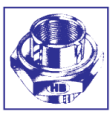

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

আই এস জঙ্গিদের টার্গেট এখন ভারত

আলকায়দার শাখা আমাদের দেশে স্থাপন হইবার পর এই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি কি করিবে? তাহারা কি আলকায়দার সঙ্গে সরাসরি মিশিয়া যাইবে? না আলকায়দাকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিবে? এই দেশে আর ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ভোটের লোভে মুসলমান তোষণ। এই তোষণের ফলেই আজ আমাদের দেশে আই এস আই জঙ্গিসন্ত্রাসবাদের এত বাড়বাড়ন্ত। রাজনৈতিক দলগুলি কেহ পরোক্ষভাবে, কেহ বা গোপনে এই সন্ত্রাসীদের মদত দিতেছে। আই এস আই পরিকল্পনামাফিক এই দেশে সন্ত্রাস চালাইতেছে আর ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি তাহাদের ফাঁদে পা দিয়া দেশকে গভীর অরাজকতার দিকে লইয়া যাইতেছে। অনুপ্রবেশ, নারীপাচার, জাল টাকার রমরমা ইত্যাদি তো রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন না থাকিলে সফল হইবে না। পশ্চিমবঙ্গে আজ কাহাদের সৌজন্যে সীমান্তে অনুপ্রবেশ-সহ অরাজকতা চলিতেছে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই রাজ্যেই এক নিষিদ্ধ জঙ্গিসংগঠনের নেতা কাহাদের সৌজন্যে রাজ্যসভার সদস্য হইয়াছেন তাহাও সকলেই অবগত। চিটফান্ডের অর্থ জঙ্গিসংগঠনের হাতে যাইতেছে বলিয়া এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় বারম্বার যে অভিযোগ তোলা হইয়াছিল তাহাও আজ সিবিআই দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গই যে আজ সন্ত্রাসীদের গেটওয়ে তাহাও গোয়েন্দারা বুঝিতে পারিয়াছেন। রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের ২২১৬ কিলোমিটার সীমান্তের বেশ কিছু পয়েন্ট রীতিমতো মাথাব্যথার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলি যে এই সীমান্ত ব্যবহার করিতেছে তাহা বারেবারেই প্রমাণ মিলিয়াছে। গত মাসে কলকাতার জেল হইতে মুম্বই আদালতে পাঠানোর সময় ট্রেন হইতে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়া পালাইয়াছে লস্করজঙ্গি শেখ আবদুল নাইম। কয়েক বছর পূর্বে বনগাঁ সীমান্তে নাইম-সহ চারজন ধরা পড়িয়াছিল। হায়দরাবাদে মক্কা মসজিদ ও মুম্বই বিস্ফোরণে যুক্ত ছিল নাইম। জুনের শেষ সপ্তাহে কলকাতা পুলিশের হাতে ধৃত পুনের জার্মান বেকারি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত জাহিদ হোসেন কুষ্টিয়ার মীরপুর হইতে এই সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতায় ঢুকিয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে এই রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা ১০ জেলার মধ্যে ৬টি জেলা দিয়া জঙ্গিরা পারাপার করিতেছে। পূর্বাঞ্চলের প্রায় চার হাজার কিলোমিটার সীমান্তের ৪৬টি অতি স্পর্শকাতর এলাকা দিয়া অনুপ্রবেশ চোরাচালান চলিতেছে।

আলকায়দার সহিত ভারতে ঘাঁটি গাড়িতে চাহিতেছে ইসলামিক স্টেট (আই এস)। বস্তুত সোশ্যাল মিডিয়ায় জিহাদের মতাদর্শ প্রচার করিয়া ভারতীয় মুসলমান তরুণদের উস্কানি দিতেছে আই এস। গত দুই মাসে জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে আই এস-এর পতাকা, ব্যানার ও দেওয়াল লিখন দেখা দিয়াছে। আই এস চাহিতেছে মুসলমান যুবকদের মধ্যে নূতন করিয়া জিহাদের উন্মাদনা জাগাইতে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি ভোটের লোভে এই কাজে সহায়তা করিবে। আই এস জঙ্গিদের নৃশংসতা আজ বহুল প্রচারিত। গাজায় ইজরায়েলি হামলা লইয়া যাহারা মহামিছিল করিয়া থাকে তাহারাই আবার সীমান্তে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী হামলা লইয়া বোবা কালা সাজিয়া থাকে। এই দ্বিচারিতা বন্ধ হইবার প্রয়োজন। দিন আসিয়াছে ইহার প্রতিবাদ করিবার এবং ইহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার। বস্তুত আজ ইজরায়েলের পথ এবং পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা সম্ভব। উল্লেখ্য, একদিন যাঁহারা পাকিস্তান বাংলাদেশের মৌলবাদীদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এই দেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই আজ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই কাপুরুষেরা সেইদিন স্ত্রী কন্যাকে মৌলবাদীদের দ্বারা নির্যাতিতা ধর্ষিতা হইতে দিয়াছিলেন, আজ এই দেশকে মৌলবাদীদের হাতে তুলিয়া দিতে তৎপর। ইহারা ভারতজননীর গর্ভের লজ্জা।

সুভাষিত

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা
মানিক্যযুক্তৌ চরণৌ বা তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।। —চাণক্যনীতি

কাকের ঠোঁট যদি স্বর্ণখচিত হয়, চরণদুটি যদি মণিমাণিক্য খচিত হয়, এক একটি পালকে যদি গজমুক্তা থাকে, তবু কাক কখনো রাজহাঁস হতে পারে না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহযোদ্ধার পাশে দাঁড়াল আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি বারাণসীতে সঙ্ঘ পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার অমর সেনাধ্যক্ষ নেতাজীর সহকর্মী শতায়ু কর্নেল নিজামুদ্দিনকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে আবেদন পাঠানো হলো। প্রসঙ্গত গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে বারাণসীর এই ১১৪ বছর বয়সী জীবন্ত কিংবদন্তী নিজামুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পা ছুঁড়ে প্রণাম করার দৃশ্য অনেকেই টি ভি সম্প্রচারে দেখেছেন। প্রসঙ্গত স্বাধীনতা সেনানীদের প্রতি মোদীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধার আরও একটি প্রকাশ দেখা গেল তাঁর সাম্প্রতিক জাপান সফরে। সাইচিরো মিশুমি নামের নবনিতপর নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের সে দেশে একমাত্র জীবিত সহকর্মীর সঙ্গে আবেগমথিত কথোপকথনে।

গত সপ্তাহে বারাণসী থেকে পূর্বতন সেন্ট্রাল ইনফর্মেশন কমিশনার ওপি কেজরিওয়াল, বিশাল ভারত সংস্থানের সভাপতি রাজীব শ্রীবাস্তব ও ভারতীয় আওয়াম দলের সভাপতি নাজমা পরভীনকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল আর এস এস কার্যকর্তা ইন্দ্রেশকুমারের সঙ্গে দিল্লীতে সাক্ষাৎ করে কর্নেল নিজামুদ্দিনকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিচয়ে অভিষিক্ত করার আবেদন জানান।

সংবাদে প্রকাশ শ্রীকুমার চটজলদি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আবেদনটি সদর্থকভাবে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও লেখেন যে আর এস এস স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যোগ্য সম্মান দেওয়ার প্রশ্নে দায়বদ্ধ।

প্রসঙ্গত উত্তরপ্রদেশের ঢাকোয়া গ্রামের আদি বাসিন্দা নিজামুদ্দিন সুভাষচন্দ্রের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে (আই এন এ) যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী ১৯৪২-১৯৪৫ তিনি সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর কাছে এই সংক্রান্ত প্রমাণপত্র হিসেবে রয়েছে রিলিফ ও রিপ্যাট্রিয়েশন কাউন্সিল আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সহযোগী সংগঠনগুলির তৎকালীন রেঙ্গুনস্থিত চেয়ারম্যানের দেওয়া একটি ভারতে ফিরে যাওয়ার আদেশনামা (Repatrition Certificate)।

আর এস এস কার্যকর্তা খুনে সি বি আই তদন্তের দাবি মানল কেরল সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আর এস এসের দাবি মেনে কেরলের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ ডি এফ সরকার কান্নুর জেলার কাথিরুড অঞ্চলে সঙ্ঘের কার্যকর্তা মনোজের খুনের সিবিআই তদন্তেরই সুপারিশ করেছে। প্রসঙ্গত গত ১ সেপ্টেম্বর মনোজের হত্যায় সিপিআইএম নিয়ন্ত্রিত একটি খুনে বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কেরল সরকারের গৃহমন্ত্রী রমেশ চেন্নিথালা জানান ঘটনার অত্যন্ত গুরুতর মাত্রা বিবেচনা করেই এই তদন্তের আদেশ দেওয়া হলো।

প্রসঙ্গত গৃহমন্ত্রী আরও জানান যে রাজ্যের ডি জি পি-এর সুপারিশ এর ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থ নেই এবং কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করেও এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। রাজ্য বিজেপি অবশ্যই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। পুলিশি তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক ভাবে এই হত্যা মামলায় ৮ জনের বিরুদ্ধে বেআইনি কাজকর্ম (প্রতিরোধ) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার ১৫ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে বিজেপি ও আর এস এসের পক্ষে একটি প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী ওমান চণ্ডীর সঙ্গে দেখা করে ঘটনার সিবিআই তদন্ত দাবি করেছিল। ঘটনার ভয়াবহতা উল্লেখ করে কেরলের বিশেষ পুলিশ তদন্ত দলের পক্ষে জানানো হয় হত্যাকারীরা ঘটনা ঘটানোর আগে ব্যাপক বোমাবাজি করে ত্রাসের সঞ্চার করে এবং মনোজের গলার নলি চেপে তাকে হত্যা করা হয়।

স্বয়ং গৃহমন্ত্রী চেন্নিথালা বলেছেন, ২০১২ সালে বিদ্রোহী মার্কসবাদী নেতা চন্দ্রশেখরেনের হত্যার পর এমন নৃশংস হত্যা কেরলের বুকে আর ঘটেনি। চেন্নিথালা আশঙ্কা ব্যক্ত করে আরও বলেন, এই কাথিরূঢ় হত্যাকাণ্ডের যোগ রাজ্যের বাইরে থাকতে পারে, এমনকী এই ঘটনার যোগসাজশ যে ভারতের বাইরে উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনাও তিনি উড়িয়ে দেননি।

উল্লেখ, আর এস এসের নিহত কার্যকর্তা মনোজের সঙ্গে একই গাড়িতে থাকা অপর কর্মী প্রমোদ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

অত্যন্ত ভারী চপার দিয়ে তাঁকে কোপানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে। পুলিশ ইতিমধ্যে চার্জশিটে নাম থাকা বিক্রমের নামে লুক আউট নোটিশ জারি করেছে। আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদে প্রকাশ, জনৈক রাজ জৈন নামে এক ব্যক্তি সুদুর দুবাই থেকে এই ঘটনার সাফল্যে তাঁর কমরেডের উদ্দেশে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর ফেসবুকে। এই কারণেই এই হত্যার পেছনে চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছে পুলিশ।

বৃটিশ কিশোরীদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত নাগরিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদে প্রকাশ, উত্তর ইংল্যান্ডের রদারহ্যাম শহরের কয়েকটি সোসাল কেয়ার হোমে আবাসিকদের মধ্যে প্রায় ১৪০০ কিশোরীর ওপর বিগত ১৬ বছর ধরে বিনা বাধায় যৌন নির্যাতন চালিয়ে আসছে মূলত এশিয়ান বংশোদ্ভূত এক শ্রেণীর নাগরিক। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর রদারহ্যাম কাউন্সিল লিডার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রসঙ্গত দক্ষিণ ইয়র্কশায়ার পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে সংঘটিত এই অপরাধের বিরুদ্ধে একটি স্বাধীন তদন্তকারী দল গঠন করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, নির্যাতনকারীরা সকলেই আদতে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক। সংবাদে প্রকাশ, নির্যাতিতদের মধ্যে ১১ বছরের কিশোরীও বাদ যায়নি। প্রাথমিকভাবে উত্তর ইংল্যান্ডের নানান জায়গা থেকে প্রধানত সাদা চামড়ার এই নাবালিকাদের মদ ও নানান ড্রাগ খাইয়ে সোসাল হোমগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুখ খুললেই খুন করে ফেলার হুমকি দেওয়ায় এই হতভাগ্যেরা কিছুই প্রকাশ করতে পারেনি। তথ্য অনুযায়ী জনৈক কিশোরী তার দুর্দশার কাহিনী বলা শুরু করতেই তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হয়। আশ্চর্যের কথা ওই সংস্থার পরিচালক ঘটনাটিকে হালকা করে দেখাবার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার পরিবর্তে স্থানীয় দক্ষিণ ইয়র্কশায়ার থানার পুলিশ উল্টে মেয়েগুলির বদনাম করতে শুরু করে। তদন্ত সূত্রে জানা গেছে ওই মেয়েদের অধিকাংশই দীর্ঘদিন ধরে গণধর্ষণের শিকার। ধর্ষণকারীরা সকলেই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক।

এই ঘটনায় পুলিশের এত দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে গোটা উত্তর ইংল্যান্ড তোলপাড় হওয়ায় অনেকেই নড়ে চড়ে বসেছেন। প্রাপ্ত তথ্য খোঁজখবর করে দেখা যাচ্ছে রদারহ্যামের ওই অকুস্থলটি প্রচুর সংখ্যায় মুসলমান অধ্যুষিত। বৃটেনের ইউ কে আই পি দলের মত অনুযায়ী স্থানীয় রাজনীতিবিদরা কেউই এই বিশাল মুসলমান ভোট হারাতে চান না। এই মুসলমান অপরাধীদের বিরুদ্ধে গলা তুললেই যা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। উল্লেখযোগ্যভাবে বৃটেনের সংবাদমাধ্যমের একটা গরিষ্ঠাংশই এই মতকে সমর্থন করছে। অন্যদিকে আর এক দলের মতামত একটু ভিন্ন। তাঁরা বলছেন এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে বর্ণবিদ্বেষ মাথাচাড়া দেওয়ার দায় ঘাড়ে পড়তে পারে। পরিণতিতে এই মুসলমানরা ভয়ঙ্কর দাঙ্গা বাঁধাতে পারে।

প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জোরে ও জাতিগত নৃশংসতার ভয়ে শক্তিধর বৃটেনও দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে অপ্রতিহতভাবে ঘটে চলা এমন জঘন্য পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অপরাধীদের বিরুদ্ধে নীরব থেকে নিজের দেশের গরিব কিশোরীদের নির্যাতন নির্দ্বিধায় মেনে নিল কীভাবে এটাই বিশ্ববাসীর চিন্তার কারণ। অন্যদিকে বৃটিশ মুসলমান যুব সম্প্রদায়ের নেতা রদারহ্যামবাসী মুহবিন হুসেন ঘটনাটিকে হালকা করে দিয়ে ওই কিশোরীদের অর্থনৈতিক দুর্বলতাকেই এই দীর্ঘদিনের ধর্ষণকাণ্ডের কারণ বলে অভিহিত করেছেন।

ভারতের নাগরিকত্ব চাইছে দু'শো পাক হিন্দু পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রায় দু'শো পাকিস্তানি হিন্দু পরিবারের সদস্যরা এখন ভারতের নাগরিকত্ব পেতে মরিয়া। ২০০৫ সালে এঁরা পাকিস্তান থেকে অভিবাসী হয়ে রাজকোটে বসবাস করছিলেন। বর্তমানে এদেশের নাগরিকত্ব পেতে রাজকোটের জেলা শাসকেরই দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। সৌরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক রাজধানী রাজকোটের গণেশনগর এলাকায় প্রায় একদশক ধরে বসবাস করছেন ওই দু'শো হিন্দু পরিবারের প্রায় হাজারখানেক সদস্য। তাদের ভিসার মেয়াদও ইতিমধ্যে ফুরিয়েছে এবং পাকিস্তানে বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে তাতে দেশে ফিরে যেতেও তারা ঘোর অনিচ্ছুক। কারণ সেখানে ফিরলে জীবন হানির শঙ্কা কোনোমতেই উড়িয়ে দিতে পারছে না খোদ রাজকোট প্রশাসনই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই মানুষদের রাজকোট শহরের সীমানার বাইরে যাবার অনুমতি নেই। যার ফলে জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে এঁরা চরম অসুবিধায় পড়ছেন। এই পরিবারগুলির অধিকাংশই তপশিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক দিক দিয়ে এঁরা আদতে গুজরাটের কচ্ছের পুরনো বাসিন্দা। কিন্তু ভিসা সমস্যার আটকে তাঁরা কচ্ছে নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারছেন না। এই প্রেক্ষিতে গত ১ সেপ্টেম্বর এই পরিবারগুলি রাজকোট শহরে একটি মিছিল বের করে। সেই মিছিল থেকে তাঁরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান যাতে তাঁদের অভিযোগকে গুরুত্ব তালিকায় সর্বাগ্রে রাখা হয়। রাজকোটের জেলাশাসকের কাছে নিজেদের ভারতের নাগরিকত্বের দাবির পাশাপাশি ভারতের সর্বত্র যাবার অনুমতিও প্রার্থনা করেছেন তাঁরা।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সংজ্ঞা মতো মূলত ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান থেকে উৎখাত হওয়া এই মানুষজনদের 'শরণার্থী' হিসেবে এদেশে চিহ্নিত হওয়ার কথা। সেইদিক দিয়ে এঁদের এদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যাপারটি অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য হওয়া উচিত বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

বিএসএফের শিথিলতায় গো-পাচার বাড়ছে মালদায়

সংবাদদাতা : মালদা ॥ মালদা জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি দিয়ে সম্প্রতি গো-পাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামবাসীরা উদ্বিগ্ন। বামনগোলা ব্লকের সীমান্তবর্তী এলাকার বেশ কয়েক কিলোমিটার এলাকায় এখনো কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি। খোলাবর্ডার দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী মুসলমান পাচারকারী ও এদেশের মুসলমান পাচারকারীরা সহজেই জেলা পুলিশ ও বি এস এফ-কে হাত করে গো-পাচার করতো। নতুন কেন্দ্রীয় সরকার আসার পর সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এই গো-পাচারের মাত্রা বেড়ে গেছে। বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট এবং তৎসংলগ্ন আশ্রমপুর, আদাডাঙ্গা, খুটাদহ, বটতলী, কাটরাগাছি সীমান্ত গ্রাম দিয়ে অবাধে চলছে এই গো-পাচার। পার্বতীডাঙ্গা বিলের জল-সহ ১০ কিলোমিটার এলাকা বেড়াবিহীন হওয়াতে এখানে জলের মধ্যে দিয়ে সহজেই গো-পাচার হয়, তার জন্য বিএসএফ যেমন লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিচ্ছে, তেমন রাজ্য পুলিশ বিহার, হরিয়ানা, রাজস্থান থেকে ছোট গাড়িতে গোরু ভর্তি করে সীমান্তে আনার সময়ে ঘুষ খাচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় হিন্দুরা কিংবা কোনো ক্লাব গো-পাচারে বাধা দিলে তাদেরকে পাচারকারীরা ভয় দেখাচ্ছে কিংবা টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে। ভাড়াকরা মজুররা রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে অনেক সময় গোরু নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশকে জানিয়ে কোনো ফল পায়নি স্থানীয় বাসিন্দারা। বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার মাধ্যমে গো-সম্পদ রক্ষা ও গো-পাচার রোধের কথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রচার করে জনসধারণকে সচেতন করার চেষ্টা হলেও যে ভাবে প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে গোরু বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে তাতে আগামী দিনে গোরু ও দুধের সঙ্কট দেখা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এক শ্রেণীর মুসলমান দুষ্কৃতী কালো টাকার লেনদেনের মাধ্যমে এবং বহু হিন্দু যুবকদের টাকার ফাঁদে ফেলে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে কলুষিত করছে। তাছাড়া কৃষকদের সীমান্তবর্তী ফসলী জমি পাচারকারীদের গোরুর পায়ে বিনষ্ট হওয়ায় তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিএসএফ এবং রাজ্য পুলিশের এই দুষ্টচক্রকে দমন করে সীমান্তে গো-পাচার বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছে। তবে সহজে এই চক্রকে বন্ধ করা সম্ভব নয়, যদি না রাজ্য সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণ সচেতন হয়। তবে কোনো কোনো মহল মনে করছে বিএসএফ কড়া হলে গো-পাচার বন্ধ করা সম্ভব হবে।

জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রাতেও পুলিশ-মুসলমানদের বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরেও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী পালন ও সেই উপলক্ষে শোভাযাত্রা পুলিশ-প্রশাসন এবং মুসলমান নেতারা বন্ধ করে দিল। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার চাকুলিয়া থানার বালিগাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে গত ১৭ আগস্ট। বালিগাড়া, শকুন্তলা, চাকুলিয়া এবং আশেপাশের ১০/১৫টি গ্রামের হিন্দুরা জন্মাষ্টমী পালন ও শোভাযাত্রার বিষয়টি চাকুলিয়া থানায় আগেই জানিয়েছিল। এদিকে সাম্প্রদায়িকতা ও সমস্ত বিষয়ে রাজনীতি করনেওয়ালারা কীভাবে চুপচাপ বসে থাকে? তারা উৎসবের উদ্যোক্তা ২২ জন হিন্দু ও জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চাকুলিয়া থানার আই সি-র কাছে এক দরখাস্ত জমা দেয়। অনুষ্ঠানের দিন শকুন্তলা মোড় থেকে শোভাযাত্রা পূর্বনির্ধারিত রাস্তা ধরে এগিয়ে চাকুলিয়া হয়ে বালিগড়া দুর্গমন্দিরের দিকে আসার পথে ৫০০ মিটার দূরেই স্থানীয় কিছু মুসলমান ও পুলিশ শোভাযাত্রার পথ আটকায়। এই শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল। চাকুলিয়া থানার পুলিশ অধিকারিক শোভাযাত্রার সঙ্গেই ছিলেন। শোভাযাত্রার উদ্যোক্তা হৃষীকেশ সাহা, ডাঃ নারায়ণ সরকার, অসিত সরকার, গোপিকান্ত সিংহ উপস্থিত পুলিশ আধিকারিককে বলেন— "এটা তো শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় শোভাযাত্রা, আমরা তো কোনো অশান্তি সৃষ্টি করিনি, আর একটু সময় পরে শোভাযাত্রা শেষ হবে। শান্তিতে শেষ হতে দেওয়া আপনার দায়িত্ব।" এসব কথাবার্তার মধ্যেই ইসলামপুর মহকুমা পুলিশ অফিসার সুবিমল পাল ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তিনি হিন্দুদের কাছে সমস্ত কথা শুনে শোভাযাত্রা ঠিকভাবে দুর্গামন্দির পর্যন্ত যাওয়ার জন্য থানার পুলিশ অফিসারের কাছে আবেদন করেন। স্থানীয় এম এল এ ও নেতাদের চাপে পুলিশ শোভাযাত্রা আটকানোয় স্থানীয় হিন্দু জনমানসে খুবই ক্ষোভের সঞ্চার হয়। স্থানীয় লোকেদের অভিযোগ, মুসলমান তোষণের জন্য তৃণমূল নেতারা প্রায় এরকম শান্তিভঙ্গের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। হিন্দুদের যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এভাবেই টিএমসি- মুসলমান জোট বাধা দিচ্ছে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার মাহেশ্বরী সদনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ-র হাতে স্বস্তিকার 'অমিত শাহ বিশেষ সংখ্যা'টি তুলে দিচ্ছেন স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। একেবারে বাঁ দিকে রয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা।

সুদিন আসার ইঙ্গিত : গরিব-বড়লোককে সঙ্গে নিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একদিকে ক্ষমতায় আসার একশো দিনের মধ্যে এই প্রথমবারের জন্য দেশের জিডিপি ৫.৭ শতাংশে পৌঁছে যাওয়া, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর জন ধন যোজনায় প্রথমদিনই বিপুল সাড়া মেলে দেড় কোটি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা— সব মিলিয়ে নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের উড়ানে ভারতের অর্থনীতি। সুদিন আসার স্বপ্ন তাই দেখতে শুরু করেছে ভারতবাসী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন— ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষের প্রথম এক-চতুর্থাংশে ক্ষেত্রে উৎপাদন শিল্প, রপ্তানি ইত্যাদি ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সরকার দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে আশা করা হচ্ছে বছরের বাকি অংশে এই ফলাফল আরও ভালো হবে।

গত ২৯ অগাস্ট এব্যাপারে কেন্দ্রীয় তথ্যপরিসংখ্যান কার্যালয় (সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিস বা সি এস ও) যে পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাতে দেখা যায়, বর্তমানে দেশের এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পেছনে রয়েছে মূলত দু'টি ক্ষেত্র। প্রথমত, চাকরি ক্ষেত্র, দ্বিতীয়ত বৈদ্যুতিক গ্যাস ও জল সরবরাহ ক্ষেত্র। ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষের প্রথম এক-চতুর্থাংশ সময়ে এই দু'টি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১০.৪ ও ১০.২ শতাংশ। ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট খুশি করেছে শিল্পপতি ও উদ্যোগপতিদের। অর্থনৈতিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এন.সি.এ.ই.আর. দেশের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা ও ইতিবাচক বিনিয়োগ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এপ্রিল '১৪-র চেয়ে জুন '১৪-য় ব্যবসা আস্থা সূচকের বৃদ্ধি প্রায় ১৭ শতাংশ বেশি বলে জানিয়েছে। এত অল্প সময়ে এই বৃদ্ধিও অভূতপূর্ব।

একদিকে দেশের জিডিপি-র হার বাড়িয়ে যখন শিল্পপতিদের মন ছোঁয়ার চেষ্টা করছে সরকার, অন্যদিকে 'অর্থনৈতিক অস্পৃশ্যতা' দূরীকরণে প্রধানমন্ত্রীর জন-ধন যোজনার মধ্যে দিয়ে গরিবদের ব্যাঙ্কে খাতা খোলার সুযোগ দিতে চাইল সরকার। অর্থনীতিবিদরা সরকারের এই আর্থিক নীতির প্রবল প্রশংসা করে বলছেন, দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বলতে যে শুধু উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, ভারতের অসংখ্য গরিব মানুষও যাতে এই উন্নয়ন-যজ্ঞে শরিক হতে পারে সে ব্যাপারে এই প্রথম কোনো সরকার সদর্থক পদক্ষেপ নিল।

দেশের মানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

গূঢ়পুরুষের

কলম

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের ১০০ দিন সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এখনই সঠিক সময় এই সরকারের কাজের পর্যালোচনা করার। অর্থাৎ দেশবাসীর প্রত্যাশা কী ছিল এবং প্রাপ্তি কতটা পূরণ হয়েছে। মোদীজীর প্রধান দুটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, আর্থিক উন্নয়ন ও মূল্যবৃদ্ধি রোধ। এছাড়াও ছিল প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি দমন, শিল্পোন্নয়ন, কালো টাকা উদ্ধার এবং কাশ্মীরের বিতাড়িত হিন্দু পণ্ডিত পরিবারের সকলকে নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়ে আনা। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম ১০০ দিনের কর্মসূচিতে এই কাজগুলি করার কথা।

প্রথমেই দেশের আর্থিক উন্নয়নের কথায় ধরা যাক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে চলতি আর্থিক বছরের প্রথম তিন মাসে (এপ্রিল— জুন, ২০১৪) সারা দেশে আর্থিক উন্নতি হয়েছে ৫.৭ শতাংশ। গত ৯ বছরে এই উন্নতি সর্বোচ্চ। প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে মোদীজী লক্ষ্য করেন যে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রকল্প নানা রকম মামলা মোকর্দমায় বহু বছর ধরে আটকে আছে। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগের অভাবে এইসব অচল উন্নয়ন প্রকল্পের সঠিক সংখ্যাও অজানা। দপ্তরের মন্ত্রীরাও এইসব প্রকল্পের খবর রাখেন না। মোদীজীর নির্দেশে কেন্দ্রে একটি ন্যাশানাল ডাটা লিটিগেসন গ্রিড গড়া হয়েছে। এই সংস্থার কাজ হচ্ছে মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করে বন্ধ হতে বসা কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলি অবিলম্বে চালু করা। এই সংস্থার কাজকর্ম সরাসরি তদারক করবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। সারা দেশের হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে প্রতি বছর বিস্তর জলঘোলা হয়। এর কারণ, বিচারপতি নিয়োগের নির্দিষ্ট স্বচ্ছ নীতি নেই। নেহরুর আমল থেকে যে পদ্ধতি চালু ছিল তা' আজও চলছে। অথচ সময়ের সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচারপতি নিয়োগে অযথা আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির জন্য উচ্চ আদালতগুলিতে মামলার পাহাড় জমছে। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রের কোনো সরকারই দ্রুত বিচারপতি নিয়োগ করে বকেয়া মামলার নিষ্পত্তির কথা ভাবেনি। মোদীজী ভেবেছেন এবং বিচারপতি নিয়োগের জন্য সংসদে 'ন্যাশানাল জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস্ কমিশন বিল-২০১৪' ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়ে নিয়েছেন।

দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদীজী। ক্ষমতায় আসার ৬০ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থে একটি সরকারি ওয়েবসাইট চালু করেছে। এই ওয়েবসাইটের (www.mygov.nic.in) মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরিচালনা ও দুর্নীতি সম্পর্কে নিজেদের মতামত জানাতে পারেন। মোদীজী মনে করেন সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষাই প্রশাসনের প্রধান কর্তব্য। তাই দেশের সাধারণ মানুষকে সরকারি কাজকর্মে যুক্ত করতেই এই ওয়েবসাইট চালু করেছেন মোদীজী। এর আগে এই জরুরি কাজটি দেশের অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী করেননি।

লুকিয়ে রাখা কালো টাকার উদ্ধারে মোদীজী বিচারপতি এম বি শাহের নেতৃত্বে একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেসন টিম (সিট) গঠন করেছেন। কালো টাকা উদ্ধার করা ছাড়াও এই বিশেষ তদন্তকারী সংস্থার কাজ হচ্ছে কালো টাকার উৎসগুলি খুঁজে বের করা। প্রাথমিক রিপোর্টে সিট জানিয়েছে ভারতে কালো টাকার প্রধান দুটি উৎস হচ্ছে বেসরকারি খনি এবং বহুতল আবাসন নির্মাণ ব্যবসা। মোদীজী দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি তাঁর মন্ত্রীদের স্পষ্ট বলে দিয়েছেন নিজের ব্যবহারের জন্য গাড়ি কেনা চলবে না। এমনকী নিজেদের দপ্তরের জন্য বছরে ১ লক্ষ টাকার বেশি খরচ করা যাবে না। অর্থাৎ, আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও নীতি মোদীজী প্রথম দিন থেকেই অনুসরণ করছেন। কালো টাকা ছাড়াও খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির একটি বড় কারণ আরব দেশগুলিতে চড়া দামে রপ্তানি। গত জুন মাসে খাদ্যশস্যের পাইকারি মূল্যসূচক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার পরেই ১৭ জুন কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যশস্যের রপ্তানি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। দেশের মানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন মোদীজী।

তবে মোদীজী প্রথম ১০০ দিনের কাজের তালিকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর জাপান সফর। এই সফরে ভারতের শিল্পায়নের জন্য জাপান ৩৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মোদীজীর আগে দ্বিতীয় কোনো প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে গিয়ে এমন বিপুল পরিমাণ বিদেশি লগ্নি আনতে পারেননি। ১৯৯০ সালে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের মুসলমান জঙ্গিরা বিতাড়িত করেছিল। তারপর বিজেপি-র নেতৃত্বে অটলবিহারী বাজপেয়ীর এনডিএ সরকার পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের জন্য তেমন কিছু করেনি। মোদীজী বাজেট অধিবেশনের প্রথমদিন সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে হিন্দু পণ্ডিতদের উপত্যকায় নিজ বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনে কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম সাহায্য করবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে সামান্য কিছু ব্যর্থতাও আছে।

মোদীজী শপথ নেওয়ার পর পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দেখা গেছে পাকিস্তান ও চীন ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক চায় না। কাশ্মীরে পাক সীমান্তে গুলির লড়াই বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনা সেনারা গত তিন মাসে ৩৪৪ বার সীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। অরুণাচলের ৯০ হাজার কিলোমিটার এলাকা নিজের দখলে আনতে চীন সক্রিয়। ভারত সীমান্তে এই দুই রাষ্ট্রের ছায়াযুদ্ধ প্রতিরোধে মোদী সরকার এখনও সফল হয়নি।

মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মা-মাটি-সারদা জিন্দাবাদ

মাননীয় কুণাল ঘোষ
প্রাক্তন সাংসদ-সাংবাদিক
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল
কলকাতা

কুণালবাবু, আপনি নিজেকে 'সাংসদ সাংবাদিক' হিসেবে দাবি করতেন। এই পরিচয়টাই আপনার চ্যানেলে দেওয়া হোত। যদিও আপনি ছিলেন সারদা গোষ্ঠীর গ্রুপ মিডিয়ার সিইও। আমি আপনার পছন্দের সেই পরিচয়টাই ব্যবহার করলাম। যদিও আপনি এখন আর সাংবাদিকও নন, বরং সংবাদ। আর ল্যাজে পা পড়তেই আপনার সাংসদ পরিচয় কেড়ে নিয়েছেন আপনার প্রাক্তন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এককালে আপনিও তাঁকে দিদি জ্ঞানে পুজো করতেন। কিন্তু দিদি শাস্তির ব্যবস্থা করায় এখন তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা করছেন। আপনি বলেছেন, সারদার মিডিয়া গোষ্ঠীর থেকে সব থেকে বেশি সুবিধা পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা আর নতুন কথা কী? সবাই জানে। তখন দিদির কাশি হলে, ঘুসঘুসে জ্বর হলেও চ্যানেল টেন-এ বড় বড় ব্রেকিং যেত। কিন্তু আজ আপনি যে ডেলোর বাংলোয় হওয়া সুদীপ্ত-মমতা বৈঠকের কথা বলছেন সেটা কেন সেদিন খবর করেননি? দিদি বারণ করেছিলেন? জানি এখন দিদিকে ফাঁসানোর জন্য সেসব আপনি বলবেন। কিন্তু রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রীর কী এক শিল্পপতির সঙ্গে গোপন বৈঠক করার স্বাধীনতা নেই! আপনি বলবেন, স্বাধীনতা আছে কিন্তু গোপনে কেন? সত্যিই তো গোপনে কেন? আপনিই তো সেই বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে শোনা যায়, তবে গোপনে ব্যবস্থা করেছিলেন কেন? দিদি বলেছিলেন বলে? আরে দিদি তো বলবেনই। কারণ আপনি না জানলেও, বাংলার মানুষ না জানলেও দিদি বরাবরই জানতেন সুদীপ্ত সেন লোকটা মোটেই সাদা ব্যবসায়ী নন। তাঁর কোনো কোম্পানিই লাভ করার জন্য নয়, গরিবের থেকে নগদে নেওয়া টাকা কালো থেকে সাদা করার জন্যই তাঁর যাবতীয় কারবার।

দুনিয়ার সবাই জানে, সারদার টাকা যাতে মা-মাটি-মানুষের (পড়ুন তৃণমূলের) কাজে লাগে সেজন্য দিদি দুই ভাইকে নিয়োগ করেছিলেন। সাফল্য দেখানোর জন্য একজন পুরস্কার হিসেবে পান মন্ত্রী পদ অন্যজন সাংসদ পদ। একজনের নাম মদন অপরজন কুণাল। এছাড়াও এলাকা ভাগ করে কিছু তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট নিয়োগ করেছিলেন দিদি। সাধারণের টাকা সংগ্রহ করবে সারদার এজেন্ট। আর সারদার সংগৃহীত টাকা আদায় করবে তৃণমূলের এজেন্ট। যেমন শ্যামাপদ, শুভেন্দু, জ্যোতিপ্রিয় ইত্যাদি। আর সবার ওপরে থাকবেন এজেন্টদের টিম লিডার মুকুল। এছাড়াও আলাদা ভাবে কিছু স্বশাসিত এজেন্ট ছিলেন। তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রাপ্য কমিশনটুকু দিয়ে নিজেদের মতো টাকা আদায় করেছেন সুদীপ্ত সেনের থেকে। তাঁদেরই কারও নাম নিতু, কারও নাম রজত। কেউ ক্লাব কর্তা, কেউ প্রাক্তন পুলিশ কর্তা।

হ্যাঁ কুণালবাবু, দিদি এসব করেছিলেন। কারণ দিদি চেয়েছিলেন গরিবের টাকা শুধু বড়লোক যেন নিতে না পারে। গরিবের টাকায় একটা গরিব রাজনৈতিক দল যদি বড়লোক হয় তবে সেটা গরিবেরই জয়। আজ সেই জয় এসেছে। গরিব পার্টি বড়লোক হয়েছে। তার জন্য গরিবের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের কাজ যে সংস্থা করছে তাকে একটু সুযোগ সুবিধা দিলে ক্ষতি কী? রেলের বরাত, ডেলোয় বৈঠক এসব না হলে পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা একের পর এক নির্বাচনে এত পয়সা খরচ কি সম্ভব হোত?

আপনি বলেছেন, দিদি সারদা মিডিয়ার সুবিধা নিয়েছেন। না, এটা ভুল কথা। দিদির সম্পর্কে কুৎসা। শুধু মিডিয়া নয়, দিদি সবরকম সুবিধাই নিয়েছেন সারদা কর্তার থেকে। শুধু সারদা নয়, অ্যালকেমিস্ট থেকে রোজভ্যালি সব গোষ্ঠীর থেকেই প্রচুর সুযোগ নিয়েছেন, নিয়ে চলেছেন। কিন্তু সেসব নিজের জন্য নয়। দিদি সেই সাহস দেখিয়েছেন বলেই তৃণমূল কংগ্রেস একক ভাবে দেশের প্রধান কয়েকটা বিরোধী দলের মধ্যে একটা। সারদার অর্থবল ছিল বলেই দেশ জুড়ে মোদী হাওয়ার মধ্যেও ঘাসফুলের পালে উল্টো হাওয়া লেগেছে। টাকায় কী না হয় কুণালবাবু! ১৫ লক্ষ টাকা মাইনে পাওয়া আপনি নিশ্চয়ই সেটা ভাল বোঝেন। আজ সারদা গোষ্ঠীকে নিয়ে এত হইচই। কিন্তু সুদীপ্ত সেন না থাকলে বাংলার এত বড় একটা ট্যালেন্ট সামনেই আসত না। একটা গরিব ঘরের সাধারণ মেয়ের ছবিও যে প্রায় দুই কোটি টাকায় বিক্রি হতে পারত না এই দুনিয়া।

আপনি হয়তো বলবেন এত কিছুর পরও টাকা কলঙ্ক ঢাকা দিতে পারে না। অত টাকা বেতন পেয়েও আপনাকে জেলে যেতে হয়েছে। কোটিপতি সুদীপ্ত সেনও জেলে। একে একে যারা সব জেলে ঢুকছে তারা সবাই কোটি কোটি টাকার মালিক। সুতরাং দিদিও...

না কুণালবাবু, ওকথা মুখেও আনবেন না। মনে রাখবেন দিদির যদি তেমন কিছু হয় তবে সেটা গরিবের পরাজয় হবে। আর টাকা দিয়ে সম্পর্ক কেনা যায় না। আমার মতো দিদির একনিষ্ঠ ভাইদের কেউ কিনতে পারবে না। দিদির যদি জেল যাত্রা হয় তবে সেদিনও জেলের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেব—মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ... মা-মাটি-সারদা জিন্দাবাদ।

— **সুন্দর মৌলিক**

প্রধানমন্ত্রী মোদীর জাপান সফর সহযোগিতার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাঁচ দিনের জাপান সফর করে ফিরেছেন। এটা তাঁর প্রথম জাপান সফর নয়। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি প্রথমবার জাপান সফর করেছিলেন। তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতামালার পুস্তক সঙ্কলন ও ভগবদ্ গীতা উপহার হিসাবে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারত ও

জাপানের সম্পর্ক বহু শতাব্দীর পুরাতন। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের মাটি থেকেই জাপানে পৌঁছেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাপান সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল।

হোক্কাইডো, হোনসু, সিকোকু, কিউসু— এই চারটি প্রধান দ্বীপ নিয়ে যে রাষ্ট্রের প্রধান ভূখণ্ড কোন শক্তির বলে তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিল? জাপান বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্র যে নাগাসাকি হিরোসিমায় মার্কিন পরমাণু অস্ত্রের আঘাত সহ্য করেছে। লক্ষ লক্ষ জাপানি নর নারী শিশু নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তবুও মাত্র ৬৫ বছরের মধ্যে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বিশ্বে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং এশিয়া মহাদেশে সর্বাপেক্ষা উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাপানের মাটির নীচে না আছে তেল, না আছে আকরিক লৌহ। তা সত্ত্বেও জাপান এত উন্নত কেন হয়েছে? এর একটাই কারণ প্রতিটি জাপানি নাগরিক চরম দেশভক্ত, সামুরাই। একটা ছোট্ট ঘটনা বললে পাঠক বুঝতে পারবেন। অনেক বছর আগে নীলগিরির ওয়েলিংটন স্টাফ কলেজে যখন সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম, সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সামরিক বাহিনীর অফিসাররাও ছিলেন। জাপান থেকে এসেছিলেন কর্নেল মুরাকামী। একদিন আমায় বললেন, ''দুই-তিনদিন এখানে থাকব না, কি পড়াশোনা হয় আমাকে একটু বুঝিয়ে দিও।'' কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞাসা করি। ''মাদ্রাজে জাপানি দূতাবাসে যেতে হবে, আমার দাড়ি কামানোর ব্লেড ফুরিয়ে গিয়েছে।'' এবার আমার অবাক হওয়ার পালা।' ক্যান্টিনে এত ব্লেডের ছড়াছড়ি, আর তুমি এত খরচ করে মাদ্রাজ যাবে ব্লেড আনতে? কি করি বল, জাপানে প্রস্তুত ব্লেড ছাড়া অন্য কোনো ব্লেড ব্যবহার করি না।'' শুধু ব্লেড কেন, বিদেশি কোনো কিছুই জাপানিরা ব্যবহার করে না। আর আমরা ভারতীয়রা? বিদেশি বস্ত্র স্টাটাস সিম্বল!

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবেকে গীতা উপহার দিয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গীতা উপহার দেওয়ার জন্য স্বদেশে ফিরে সমালোচনার মুখে পড়বেন একথাও তিনি জানিয়েছেন।

নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'বিশ্বের কিছু রাষ্ট্র আজও আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে চলেছে, তারা তাদের ভূখণ্ড সম্প্রসারিত করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূমি দখল করার প্রয়াস করছে, অথবা সমুদ্রে নিজেদের অধিকারের দাবি করছে, কিন্তু ভারত ঐতিহাসিক কাল থেকে মৈত্রীবন্ধন দিয়ে সমস্ত বিশ্বকে নিজের করে নেওয়ার দর্শনে বিশ্বাসী।' তিনি জাপানের বিনিয়োগকারী এবং শিল্পপতিদের উদ্দেশে বলেন, 'ভারতে লাল ফিতের বাঁধন নয়, লাল কার্পেট তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

সমগ্র জাপান সফরে মোদী অভিভূত। জাপান সরকার দু' লক্ষ এক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আগামী পাঁচ বছরে ভারতে করবে। এই বিনিয়োগ সরকারি ও নিজ প্রকল্পে হবে। গঙ্গাদূষণ রোধ প্রকল্প, শহর উন্নয়ন (স্মার্ট শহর), পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে জাপান বিনিয়োগ করবে। ভারতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আগামী পাঁচ বছরে দ্বিগুণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারত-জাপান

সম্পর্ক বিশেষ স্ট্রাটেজিক এবং বিশ্বব্যাপী অংশীদারিতে উন্নীত হয়েছে। প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক নির্মাণ, নারীশিক্ষা ও উন্নয়ন এবং দূষণমুক্ত বৈদ্যুতিকীকরণ ইত্যাদি পাঁচটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা উপকরণ এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র এই চুক্তির দ্বারা প্রসারিত হবে। নরেন্দ্র মোদী জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ওই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুজিও কিসিদা, উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বিত্তমন্ত্রী টারো আসো সহ পাঁচজন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। দুই প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষামূলক ভাবে আহমেদাবাদ-মুম্বাই পথে দ্রুতগতির বুলেট ট্রেন চালাবার জন্য সম্মত হয়েছেন। ভারতের সর্বত্র এই দ্রুতগতির ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা কায়েম করতে তাঁরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী এই পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য সবরকম আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিচালনা ব্যবস্থার সাহায্য দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন। জাপান ভারত থেকে সূক্ষ্ম ভূমিগত ক্লোরাইড প্রস্তুত ও আমদানি করার চুক্তিও স্বাক্ষর করে।

শান্তিপূর্ণ পরমাণুশক্তি উন্নয়নের বিষয়ে এখনও কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। যেহেতু ভারত পরমাণু অস্ত্রধর রাষ্ট্র, জাপান নীতিগত ভাবে পরমাণু চুল্লি নির্মাণ ও তার জন্য জ্বালানি দিতে অপারগ। জাপান ভারতের পরমাণু নীতির সম্মান করে এবং পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধে ভারতের প্রয়াসের প্রশংসা করেছে। তবে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে বলে তাদের অভিমত। জাপানে চা-পানের আমন্ত্রণ এক বিশেষ সম্মানজনক প্রক্রিয়া। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ভারতের মন্ত্রীকে এই বিশেষ চা-পান আসরে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জাপানের সম্রাট আকিহিতোকে প্রাসাদে গিয়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন। তিনি জাপানের স্যাক্রেড হার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং কয়েকজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গেও আলোচনায় বসেছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জাপান সফর জাপানে এক মোদী-তরঙ্গ এনে দিয়েছে। তাঁর সফরের জন্য জাপান-ভারত সম্পর্ক এক নবতম পর্যায়ে পৌঁছেছে। অষ্টাদশ শতকের 'বিস্তারবাদ' যা আজও অনেক রাষ্ট্র ব্যবহার করে চলেছেন তা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। বরং একবিংশ শতাব্দীতে 'বিকাশবাদই' আদর্শ হওয়া উচিত। মোদীর এই বক্তব্য জাপানবাসীর মন জয় করেছে। আগামী দিনে শুধুমাত্র ভারত এবং জাপানই নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং বিশ্বে উন্নয়নের এক নতুন ধারার প্রবর্তন করবে বলেই আমরা আশাবাদী। ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ
সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি ১০ টাকা।
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

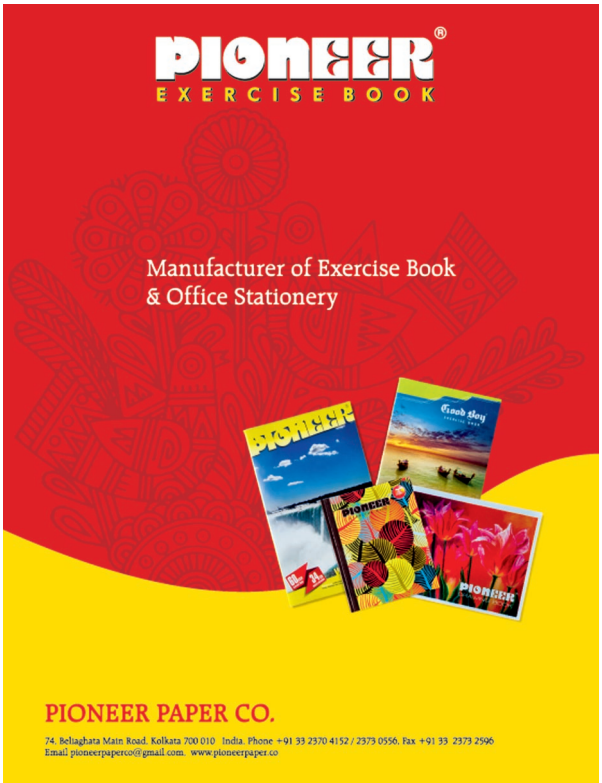

প্রাচীন ভারতে পরিবেশ ভাবনা

বিকাশ ঘোষাল

১৯৭২ সালে স্টকহোমে ১১৪টি দেশের প্রতিনিধি প্রথম আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন এবং ওই বছর থেকে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। এর ২০ বছর পর ১৯৯২ সালে ৩ থেকে ১৪ জুন ব্রাজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনিরো-তে বসেছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন— বসুন্ধরা সম্মেলন। এই সম্মেলনের মূল কথা ছিল— পরিবেশ আক্রান্ত এবং ক্লেদাক্ত। পরিবেশ সঙ্কট প্রকৃতপক্ষে

সভ্যতারই সঙ্কট। মানুষই পারে এ সঙ্কট থেকে তাকে মুক্তি দিতে। পরিবেশের সম্পদ আমাদের অস্তিত্বের মূলধন। এসব দেখেশুনে মনে হয় যে, পরিবেশ সমস্যা বোধহয় নেহাতই আধুনিক যুগের সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। একথা সত্যি যে, পৃথিবী নামক গ্রহটি যেদিন সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই এই গ্রহের ভিতরে ও চারপাশে পরিবেশ বিদ্যমান। আর পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন সমস্ত জীবেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে যারা অভিযোজিত হতে পারে না, সেই সব জীবের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দেয়, কখনও বা সেই সব প্রজাতি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সুতরাং আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে সেই আদিকাল থেকেই মানুষকে পরিবেশ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়েছে।

সভ্যতার আদিপর্বে মানুষ যখন আগুন জ্বালতে শিখল তখন থেকে পরিবেশ দূষিত হতে শুরু করল। যদিও অরণ্যের দাবানল, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ইত্যাদি ধোঁয়ার তুলনায় মানুষের জ্বালানো আগুনের ধোঁয়া খুবই কম। আবার তৎকালীন বানপ্রস্থে থাকাকালীন মানুষের বসতি স্থাপন, তপোবন নির্মাণ প্রভৃতির ফলে অরণ্য ধ্বংস হতে থাকল। ফলস্বরূপ ধোঁয়াজনিত পরিবেশ দূষণ, মৃত্তিকা ক্ষয়, জলের স্তর নেমে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী তখনকার মানুষদের চিন্তায় ফেলেছিল। তাই একদিকে তাঁরা বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার মতো কর্মসূচির মাধ্যমে অরণ্যসৃজনের চেষ্টা নিয়েছিলেন ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণের জন্য জলাশয় প্রতিষ্ঠা, কূপ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতে পরিবেশের উপাদান হিসাবে ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (তাপ বা শক্তি), মরুৎ (বাতাস) এবং ব্যোম (আকাশ)— এই পঞ্চভূতের স্বীকৃতি লাভ ঘটেছিল। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা সাধারণত পরিবেশের অজৈব উপকরণ বলতে বোঝান লিথোস্ফীয়ার (মাটি), হাইড্রোস্ফীয়ার (জল) ও অ্যাটমোস্ফীয়ার (বায়ুমণ্ডল)। পরিবেশের উপাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে পদ্মপুরাণ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এই পঞ্চভূতের পারস্পরিক ভারসাম্য না থাকলে বা বিঘ্নিত হলে পৃথিবীতে জীবকুলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। আবার বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে যে, যখনই মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাছ ও বন ধ্বংস করেছে, তখনই পরিবেশ দূষিত হয়ে নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। সে কারণেই প্রাচীন ভারতে বন এবং গাছের সংরক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হোত। বন-সংরক্ষণের একটি উপায় ছিল বনকে দেবী মনে করে পূজা করা (ঋগ্বেদ ১০, ১৪৬)। আবার বামন পুরাণে বলা হয়েছে দেবী দুর্গা বন আচ্ছাদিত বিন্ধ্যাচলে বাস করেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বনবাসী সমাজে এরূপ ধারণা আছে যে দেবদেবী ও পূর্বপুরুষদের বিদেহী আত্মা কোনো বিশেষ বিশেষ বনে বাস করে। ওই বিশেষ বনগুলিতে বনবাসীরা নিজেরা ঢোকেন না বা অন্য কাউকেও ঢুকতে দেন না। ফলে বাস্তবে ওই বনগুলো সংরক্ষিত হয়ে জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে আছে।

বন ছাড়াও বনের বাইরে কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর আরণ্যক গাছ জন্মায়। এই গাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল আহরণ করেও মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত। প্রাচীন ভারতে গাছ সংরক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি হলো :

(১) **পবিত্র গাছ :** বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে লেখা আছে— কতগুলি গাছ দেবদেবীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন রবির দেহ থেকে অশ্বত্থ, নারায়ণের নাভি থেকে পদ্ম, মহেশ্বরের হৃদয় থেকে ধুতুরা ইত্যাদি। স্বভাবতই এই গাছগুলি মানুষের কাছে পবিত্র এবং এগুলি নষ্ট করার সাহস

মানুষের ছিল না।

(২) **দেবদেবীর প্রিয় গাছ :** বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাতে বিশেষ বিশেষ গাছের পাতা, ফল, ফুল, কচিশাখা আবশ্যক; কেননা ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর ওই সমস্ত গাছ প্রিয়। যেমন বিল্বপত্র শিবের প্রিয়, নারায়ণের প্রিয় তুলসীপত্র ইত্যাদি।

(৩) **গাছের ক্ষতি করার শাস্তি :** আসবাবপত্র, জ্বালানি প্রভৃতির কারণে মানুষ বৃক্ষসকল নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। প্রাচীন ভারতে এইসব অপরাধমূলক কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। যেমন— গাছ কাটলে বা ফল চুরি করলে অপরাধী দ্বিতীয় নরকে যাবে (বামন পুরাণ, ৬১.২), গাছ চুরি করলে অপরাধীকে ত্রিরাত্রি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে (কূর্মপুরাণ, উত্তরভাগ ৩৩.৫), ফলবতী গাছ কাটলে অপরাধীকে জরিমানা দিতে হবে ও শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে হবে (অগ্নিপুরাণ) ইত্যাদি। শাস্তির ভীতি অনেককেই গাছের ক্ষতি করার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করত। আবার বড় গাছের নীচে মাটির হাতি-ঘোড়া রেখে বনদেবীর পূজা করার কারণও ছিল অপরাধীর হাত থেকে গাছকে রক্ষা করা।

গাছের সংরক্ষণ ছাড়াও প্রাচীন ভারতে গাছের সংখ্যা বাড়ানোর দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল। তাই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, কানন বা উদ্যান প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্মীয় কাজের মর্যাদা পেয়েছিল। সহস্রশীর্ষ গ্রন্থে বলা হয়েছে— 'হে রাজেন্দ্র, যদি কোনো মানুষ অন্তত একটি গাছও লাগায় তাহলে অনাদি অনন্তকাল ধরে স্বর্গে বাস করবে।' আবার বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাকালে কর্তা পাঠ করেন— 'দেব-পিতৃ-মনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাম্'। অর্থাৎ আমার এই কাজে দেবতাকুল, পিতৃকুল এবং মানুষগণ প্রীত হোন।

বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষসংরক্ষণ ছাড়াও প্রাচীন ভারতে পুষ্করিণী ও কূপ খনন এবং পুষ্করিণী সংস্কারও মানুষ পুণ্য কাজ বলে মনে করতেন। আদিত্য পুরাণে বলা আছে— যিনি জলহীন দেশে কূপ, পুষ্করিণী খনন করে তার সোপান (ঘাট) পরিষ্কার ও সেতুবন্ধনে রত থাকেন, তিনি তৃষ্ণাভয় নামক নর থেকে মুক্তিলাভ করে স্বর্গলাভ করেন। জ্যোতিষতত্ত্বে বলা হয়েছে যে, ''কূপাণাম তড়াগেষু দেবতায়নেষু চ। পুনঃ সংস্কার কর্তা তু লভতে মৌলিকং ফলম্''। অর্থাৎ যিনি কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি সংস্কার অর্থাৎ পঙ্কোদ্ধার করেন, তিনি মৌলিক ফল অর্থাৎ কূপখননের ফল লাভ করতে পারেন। বৃক্ষ বা জলাশয় প্রতিষ্ঠাতে সাধারণ মানুষের কল্যাণ ছাড়াও স্বীয়কীর্তি বজায় রাখতেও তৎকালীন বিত্তশালী মানুষেরা চাইতেন। প্রতিষ্ঠাকালে তাঁরা বলেন— 'যাবৎ বসুন্ধরা ধাত্রী যাবচ্চ শশিভাস্করৌ। তাবৎ স্থিরা তদা কীর্তি— মদীয়েয়ং ভবিষ্যতি'' অর্থাৎ যতদিন এই পৃথিবী থাকবে এবং যতদিন চন্দ্র-সূর্য থাকবে ততদিন আমার এই স্থায়ী কীর্তি বজায় থাকবে।

আলোচনা শেষে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে পরিবেশ চিন্তা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল এবং প্রাচীন ভারতীয়দের রচিত অনেক পরিবেশতত্ত্ব ও পরিবেশ সম্বন্ধীয় নির্দেশ বর্তমান যুগেও কার্যকরী হতে পারে। সুতরাং প্রাচীন ভারতের পরিবেশ সম্পর্কীয় তথ্য, তত্ত্ব এবং পরিবেশ সংরক্ষণের নীতিগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষিত হওয়া দরকার। তাহলে বর্তমান স্বাধীন ভারতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিবেশ নীতি তৈরিতে প্রাচীন অভিজ্ঞতা উপযুক্ত সহায়ক হতে পারে।

(লেখক মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা জিরাই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক)

উষ্ণায়ণ, পরিবেশ ও অশনি সঙ্কেত

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

চারিদিকে তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায়, বিশ্ব উষ্ণায়ণ এখন আমাদের দোরগোড়ায় উপস্থিত। এক এশিয় পরিবেশ বিশেষজ্ঞের মতে, আর মাত্র ৮-১০ বছরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী এক বিধ্বংসী জলবায়ু পরিদূষণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য, যদি না মানবসমাজ এই মুহূর্তে তার কোনো বিকল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না করতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2)-এর মাত্রা ০.০৩ শতাংশ ছিল, এক প্রজন্মের মধ্যে তা বেড়ে ০.০৪ শতাংশে পৌঁছে গেছে। এর ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ণের মাত্রা যে শুধু বাড়ছে তা নয়, খরার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা থেকে রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বনাঞ্চল দাবানলে জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর। এর ফল? আরো বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' (ক্রম বর্ধমান CO_2 গ্যাস ও উত্তাপ)-কে আরো ত্বরান্বিত করছে। যার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ব্যাপক হারে গলিত হয়ে সমুদ্রের জলমাত্রা ১ মিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে।

প্রাথমিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই শতকের প্রথম দশকের মধ্যে বাতাসে CO_2-র মাত্রা ০.০৩৯ শতাংশ'র বিপদসীমা ছাড়িয়েছে। এবং যার ক্রমান্বয় প্রতিফলন বর্তমানের ০.০৪ শতাংশ। যখন এই মাত্রা ০.০৪৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে

৮-১০ বছরে, সভ্যতার সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে। সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে প্রধানত তিন ভাগে। প্রথমত, বায়ুর অত্যধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে CO_2 মাত্রা বাড়ছে, যার ফলে ভূখণ্ডের উত্তাপ বিকিরণ ক্ষমতা হারাচ্ছে। এর ফলে বিশাল পরিমাণের হিমবাহ ও অতলান্তিক মহাদেশের হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার বরফশৈল গলে সমুদ্রের উচ্চতা ক্রমশই বাড়িয়ে চলেছে। সমুদ্রতটবর্তী জনপদগুলি এক এক করে লুপ্ত হতে চলেছে, যথা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ২৪ পরগনা জেলাগুলি। অদূর ভবিষ্যতে মরিশাস, মালদ্বীপ-সহ ভারতের বহু শহর বিপদগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা কম নয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে যে শুধুমাত্র তাপবৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর ১৪৭টি শহর লুপ্ত হতে চলেছে— তার মধ্যে মুম্বাই ও চেন্নাই (২০৩৪-২০৭৪), ব্যাঙ্গালোর (২০৪৬-২০৬৯), আহমেদাবাদ (২০৪৬-২০৭৫), দিল্লী (২০৫০-২০৮১), কলকাতা (২০৫৩-২০৮১) এবং হায়দরাবাদ (২০৫৭-২০৮৫)।

দু'বছর আগে আন্তর্জাতিক 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' প্রকাশনে ভারতীয় বিজ্ঞানী মধুশ্রী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, পরিবেশ ধ্বংসকারী মানব সভ্যতা নিজেই ধ্বংস হতে চলেছে, কারণ পৃথিবী তার পুনর্নবীকরণ ক্ষমতা হারাচ্ছে অতি দ্রুতবেগে। ১৯৭২ সালে যা ছিল ৮৫ শতাংশ, বর্তমানে (২০১২-র হিসাবে) তা ১৫০ শতাংশ! খুব সাধারণ ভাষায়, গত শতাব্দী পর্যন্ত আমরা আমাদের জীবনশৈলী বজায় রাখতে আমরা প্রকৃতির কাছে থেকে ৮৫ শতাংশ ধার করতাম, এখন ১৫০ শতাংশ পর্যায় পৌঁছে আমরা প্রকৃতিকে দেউলিয়া করে ছেড়ে দিচ্ছি। এর প্রতিফলন— ক্রমহ্রাসমান ফলন, ক্রমবর্ধমান জলসঙ্কট, ক্রমবিলীয়মান বনসম্পদ, পশুসম্পদ ও মৎস্যসম্পদ— আমাদের দেশের খাদ্যসমস্যার মূল কারণ। বছরে ১০ হাজারের বেশি প্রাণীসম্পদ চিরতরে বিনাশ হয়ে যাচ্ছে, যা প্রাকৃতিক বিবর্তনে বহু কোটি বছর লেগেছিল পৃথিবীতে অস্তিত্ব নিতে। আমাদের প্রয়োজনীয় জৈবসম্পদ লুপ্তমান।

তৃতীয়ত, পরিবেশ পরিবর্তন শুধু তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জলসঙ্কট, খাদ্যসঙ্কট বা জনপদ বিপর্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সৃষ্ট আবহাওয়া পরিবর্তনকামী অন্তর্রাষ্ট্রীয় সংস্থা (Inter Governmental Panal of Climate Change বা I.P.C.C.) বহু দশকের পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেছে যে, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আমরা ক্রমশই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি। যার ফলে বর্ধমান মরুভূমি, ক্রমহ্রাসমান ওজোন (Ozone) বাষ্প এবং বাতাসে ধূলিকণার অতিমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রাণের অস্তিত্ব সংরক্ষণেও আমরা নিজেদের বিপদ ডেকে আনছি। বিপদ যে মানুষেরই তৈরি সে প্রশ্ন সন্দেহাতীত। IPCC-র প্রবক্তাদের তথ্য অনুযায়ী— যার মধ্যে সংস্থার অধিকর্তা নোবেল বিজয়ী ড. আর কে পাচৌরী আছেন— শুধুমাত্র ১৯৫০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৫°—৬° সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে, যা বহু শতাব্দীতে হয়নি। একই সঙ্গে বেড়েছে নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2), মিথেন (CH_4) এবং গ্রীনল্যান্ড বরফের ওপর সালফেট এয়ারোসলের প্রলেপ, প্রতিটি ক্ষেত্রে যা উত্তাপ পুনর্বিকিরণ রোধ করতে সক্ষম। এখানেই শেষ নয়। IPCC-র রিপোর্ট অনুযায়ী পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণায়ণের ফলে বাৎসরিক অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি বছরে ৩০-৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা অর্থসম্পদও বিনাশ করে দারিদ্র্য ডেকে আনছি, যা খাল কেটে কুমির আনার সমকক্ষ। পরিবেশ ধ্বংস মানে উত্তরসূরিদের বিনাশ।

পশ্চিমবাংলা তথা কলকাতায় এর প্রভাব কতটা পড়তে পারে, তা নিয়ে বহু সংস্থার ভবিষ্যদ্বাণী আছে, সমস্ত ব্যাখ্যা এই নিবন্ধে তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব না হলে এই সমস্যাগুলির সমাধান কলকাতার অদূর ভবিষ্যত নিয়েও গভীর ভাবনা-চিন্তার অবকাশ আছে।

জলবায়ু ও পরিবেশ কি তাহলে সত্যিই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? এ নিয়ে প্রভূত আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের শেষে আমরা এর দুটি দিক দেখতে পারছি— এক, তথাকথিত উন্নতশীল দেশগুলি, বিশেষত নিজেদের স্বার্থে এর কোনো প্রতিকার করতে নারাজ। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, একমাত্র দেশ যা কিয়োটো প্রোটোকলে স্বাক্ষর করেনি। দ্বিতীয়ত, সমস্ত সমস্যার দায়ভার দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। যেন বসুন্ধরার জলবায়ু প্রদূষণকে দেশভিত্তিকভাবে বণ্টন করা যায়! মার্কিন C.I.A. প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশকে সতর্ক করে দিয়েছিল, এক দশক আগে, যে এর ভয়ঙ্কর পরিণাম যে কোনো পারমাণবিক যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ হতে চলেছে। তা সত্ত্বেও আমাদের কি ঘুম ভেঙেছে?

পরিশেষে, বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের সতর্কবাণী ('YEAR 2070') সকলের পঠনীয়— যাতে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেছেন আগামী প্রজন্মের ও পৃথিবীর শেষ পরিণাম।

(লেখক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক)

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

কলকাতা শহর কি বিপর্যয়ের দোরগোড়ায় ?

পৃথ্বীরাজ মিত্র

কেমন যেন মনে হচ্ছে আজকের কলকাতা শহর কি নিয়তি নির্দিষ্ট ধ্বংসের আগে কিছুটা ধার করা বা ঈশ্বরের করুণায় পাওয়া বাড়তি সময়ের ওপর বেঁচে আছে? একথা বলছি এই জন্য যে বিশ্বের অন্যতম মান্য— অর্থনৈতিক লেনদেন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ওপর দীর্ঘদিন গবেষণা করা বৈদ্যুতিনমাধ্যম Bloomberg-এর তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের কুড়িটি বড় শহর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে কোনো মুহূর্তেই চরম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। তাদের তালিকা অনুযায়ী মায়ানমার, সাংহাই, টোকিও, হংকং, ব্যাঙ্কক, আম্যেস্টারডাম, নিউইয়র্কের মতো বিশ্বখ্যাত শহরগুলির সঙ্গে অন্যান্য শরহগুলিও আশু বিপদসীমার তালিকায় রয়েছে। প্রসঙ্গত নিউইয়র্ক 'Sandy' ঝড়ে সম্প্রতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই সম্ভাব্য ধ্বংসপ্রবণ শহরগুলির তালিকায় মুম্বইও জায়গা করে নিয়েছে। আমরা জানি ভারতের শহরগুলির সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ (Delta) সুন্দরবন থেকে আদৌ খুব দূরে নয়। যে সুন্দরবন প্রতি বছর প্রায় নিয়ম করে জুন থেকে সেপ্টেম্বরে বর্ষার সময় বন্যার কবলে পড়ে। Bloomberg-এর সঙ্কলিত তথ্যে প্রকাশ, কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা ১৪০ বছর আগে ইংরেজ শাসকদের রাজধানী শহর থাকার সময়ে তৈরি। এই নিকাশি ব্যবস্থা দেশের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। অথচ এটি শহরের মাত্র ৫০ শতাংশ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিপর্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ সম্ভাবনার রূপরেখা তুলে ধরতে না পারলেও, Bloomberg জানাচ্ছে সামুদ্রিক জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত হয়ে উঠে গোটা শহরকে ভাসিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বঙ্গোপসাগর থেকে মাত্র ১৮০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থানের কারণে কলকাতার সমুদ্রতটে কোনো বড় ঝড় আছড়ে পড়লে শহরে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানো যাবে না। আশঙ্কার কথা হিসেবে তারা জানিয়েছে কলকাতা পৌরসভার পরিকাঠামো এই ধরনের কোনো

ফাইল চিত্র

বড় আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ আটকাবার পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নয়।

এ সম্পর্কে আমাদের দেশীয় বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই বিপর্যয়ের আশু সম্ভাবনার ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন, অবশ্যই এটিকে Wake up Call বা আগাম সতর্কবার্তা হিসেবে গণ্য করা যেতেই পারে। আবার একটি অংশ ভিন্ন মত পোষণ করে বলছেন হাতেকলমে বিপর্যয় যে ঘটবেই এমন অকাট্য প্রমাণ এখনও মেলেনি। আগামী ১০০ বছরের মধ্যে অন্তত এমন সম্ভাবনার কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। মতপার্থক্য যাই থাকুক না কেন একটা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মহল একমত যে কলকাতা প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রবণ একটি শহর আর সেরকম কিছু ঘটলে তাকে সামাল দেওয়ার মতো উপযুক্ত প্রস্তুতি তার আদৌ নেই।

এই সূত্রে Zoological Survey of India-এর পূর্বতন অধিকর্তা পরিবেশবিদ ড. এ কে ঘোষ স্বীকার করছেন প্রস্তুতি নেবার সময় কিন্তু এসে গেছে। তাঁর মত অনুযায়ী বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় IIT Delhi ও পরিবেশ এবং উন্নয়ন বিষয়ে NGO Endev-Society-র এক যৌথ সমীক্ষা অনুযায়ী— কলকাতার জন্য অপেক্ষা করছে একটি আতঙ্কময় ভবিষ্যৎ।

চমকপ্রদভাবে WWF India-এর সমীক্ষা গঙ্গায় জলস্ফীতির ক্ষেত্রে কলকাতার কোন কোন ওয়ার্ড বিপর্যয়ের মুখে পড়বে তার সরাসরি আন্দাজ পর্যন্ত দিয়েছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী সামুদ্রিক জলস্তরের নিশ্চিত বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। তাপমাত্রাতেও উষ্ণায়ন সকলেই অনুভব করছেন। এই কারণেই সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি, কেননা কলকাতা বঙ্গোপসাগর থেকে মাত্র ১৮০ কিলোমিটার দূরে। তাই ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে বন্যার সম্ভাবনা কোনো মতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আগে উল্লেখিত অপর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থার কারণে শহরের বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার মুখে পড়ারই সম্ভাবনা। ড. ঘোষও এই তথ্য সমর্থন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সাম্প্রতিক 'আয়লা'র কথা তুলে বলেন ঝড়টি মাঝামাঝি মাত্রার ৮০ কিলোমিটার বেগে কলকাতার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। পরিণামে অনেকেরই মনে পড়া উচিত বহু জায়গা ৪ দিন নিষ্প্রদীপ ছিল, গাছ পড়েছিল ৫ হাজারের বেশি আর মারা গিয়েছিলেন ২১ জন।

বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ কেন্দ্রগুলি গঙ্গার নিকটবর্তী হওয়ায় তাদেরই প্রাথমিক ধ্বংসের মুখে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। গঙ্গার তীরের সন্নিহিত অঞ্চলে যে জনবসতি তারা যে প্রথমেই ঘরছাড়া হবে একথা বলাই বাহুল্য। ড. ঘোষ প্রসঙ্গত তথ্য উল্লেখ করে জানাচ্ছেন, এই অঞ্চলে ২০০৭ থেকে ৫টি বড় ঝড়ের মুখে পড়েছে। নার্গিস, সি ডার এবং অবশ্যই আয়লা এদের অন্তর্গত। এর মধ্যে আয়লার প্রত্যক্ষ আংশিক প্রভাব

কলকাতার ওপর পড়েছিল। তাই কখনই জোর দিয়ে বলা যায় না এমনটা আর হবে না। ড. ঘোষের সঙ্গে ভিন্নমত সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্বতন অধিকর্তা প্রণবেশ সান্যাল জানাচ্ছেন, এখনও পর্যন্ত জলহাওয়া পরিবর্তনে সে রকম মারাত্মক কিছু ধরা পড়েনি যাতে নিকট ভবিষ্যতে কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। তিনি বলেন, ''শহরের অস্তিত্ব আগামী ৫০-১০০ বছরের মধ্যে বিপন্ন হয়ে পড়বে এমনটা ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। তবে সুন্দরবনে জলস্তর অবশ্যই বিশ্বের নির্ধারিত বিপদসীমা মাত্রা ২ মিলিমিটার-এর পরিবর্তে ৫ মিলিমিটার করে প্রতি বছর বাড়লেও তা বিপর্যয় ডেকে আনবে এমনটা বলার সময় আসেনি।' তবে একইসঙ্গে তিনি এও বলেন জলের লবণাক্ত'র ক্রমিক বৃদ্ধি অবশ্যই কলকাতায় বিপদ ডেকে আনতে পারে। আর এই লবণাক্ত গঙ্গাকেই দূষিত করবে এবং যার ফল অবশ্যই নেতিবাচক হবে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এখনই পরিকল্পনা করা দরকার। এই প্রসঙ্গে ড. ঘোষ জানান, তীব্র সাইক্লোন-এর পরিস্থিতি শহরের পক্ষে সবসময়ই বিপজ্জনক। তাঁর মতে আয়লার আগে কলকাতাবাসী সেরকম বিধ্বংসী ঝড় কখনও দেখেনি। ঝড় ও ঘূর্ণি বা দমকা ঝড় যেগুলি উত্তর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয় তার তীব্রতা সদাই ভয়ঙ্কর। আমেরিকার Sandy ঝড়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন যদি এই ঘূর্ণি নিউ ইয়র্কের মতো বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর শহরকে টালমাটাল করে দিতে পারে— তাহলে ভাবা উচিত এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত কলকাতার কি হতে পারে।

পরিকল্পনা

শহরের ১৮০ কিলোমিটার Trunk Sewer line-এর মাত্র ৫ শতাংশই পলিমুক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য বাকি ৯৫ ভাগ অংশই বদ্ধ যে পথে বন্যার ক্ষেত্রে দ্রুত জলনিকাশ প্রায় অসম্ভব। তথ্য অনুযায়ী মাত্র ৮ মিলিমিটার বৃষ্টি অবিরাম এক ঘণ্টায় হলেই শহরকে ভাসিয়ে দিতে যথেষ্ট। এই অবস্থার পরিবর্তনে মাত্র বছর পাঁচেক আগে মজে যাওয়া নিকাশি প্রণালীগুলিকে পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে যে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে তা আনুমানিক মোট খরচের ৫ শতাংশ মাত্র। এই পলিমুক্তকরণের ক্ষেত্রে উত্তর কলকাতার অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভয়াবহ। এখানকার পাইপ লাইনগুলি শতাব্দী প্রাচীন। সবই গঙ্গার কাছাকাছি হওয়ায় জলপ্লাবনের ক্ষেত্রে অতি সহজ টার্গেট— একথা বলেছেন স্বয়ং অমিত রায় যিনি কলকাতা পুরসভার নিকাশি পরিকাঠামো দেখাশোনার বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়ার নয়। ■

(সৌজন্যে : টি ও আই)

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যার উন্মোচন ও ভবেন্দু ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা

পুজো সংখ্যার উন্মোচন করবেন
বিশিষ্ট সাহিত্যিক এষা দে

স্মারক বক্তৃতা দেবেন
শ্রী তরুণ গোস্বামী (সিটি এডিটর, দ্য স্টেটসম্যান)

বিষয় : সত্যের সন্ধানই সাংবাদিকতা

দিনাঙ্ক : ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪, শনিবার

সময় : সন্ধ্যা ৬টা, স্থান : ভারতসভা হল, বউবাজার

ঠিকানা : ৬২, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-১২

বিশেষ আকর্ষণ : সংস্কার ভারতীর সঙ্গীতানুষ্ঠান

বিনীত,

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক, স্বস্তিকা

বিজয় আঢ্য সম্পাদক, স্বস্তিকা

বিঃ দ্রঃ - অনুষ্ঠান শুরুর দশমিনিট পূর্বে আসন গ্রহণ করবেন।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

চিঠিপত্র

জৈব কৃষিকাজ

'স্বস্তিকা'-এর ২৮ জুলাই ২০১৪, ১১ শ্রাবণ ১৪২১-এর সংখ্যার ২৯-৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত--- 'সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের অসাধ্য-সাধন/ কীটনাশকের অভিশাপ থেকে মুক্তির দিশা'— বিশেষ রচনাটি পড়ে উৎসাহিত হয়ে এই চিঠি লেখার প্রয়াস।

২০০৩ সালে রাজস্থানের আসনাওয়ার তহসিলের অন্তর্গত মানপুরা গ্রামে হুকুমচাঁদ পাতিদার জৈব-কৃষিকাজের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যে জৈব-কৃষিকাজের মাধ্যমে ডাল, গম, দানাশস্য, শাকসবজি, ফল-মূল, মশলাপাতি চাষ জনপ্রিয় করে তুলেছেন তারই একটি বিশেষ চিত্র ওই লেখাতে পেলাম। তবে ওই বিশেষ রচনাটিতে কীটনাশকের অভিশাপ সম্বন্ধে নানা ভাবে জ্ঞাত হলেও মুক্তির দিশার ক্ষেত্রটি (যেটি মূল বিষয়) বর্ধিতভাবে পেলাম না। সাফল্যের মূলমন্ত্র— অংশটি আরও স্পষ্ট হলে ভালো হোত। কীরকম জমি, জমি তৈরির পদ্ধতি, গো-ভিত্তিক ও প্রকৃতি-বান্ধব সার এবং কীটনাশক তৈরির পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগ বা ব্যবহারের বিষয়টি বেশি অংশে থাকলে ভালো হোত। নিদেনপক্ষে যোগাযোগের কোনো ঠিকানাও যদি ওই লেখার সঙ্গে সংযোজন থাকত তবে মানুষ খুব উপকৃত হোত।

শেষে নিবেদন এই যে, ভবিষ্যতে এই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানালে কৃষিকাজে নিযুক্ত মানুষজন, এমনকী আমি নিজেও আমার এলাকার মানুষদের নিয়ে ওই পদ্ধতিতে কৃষিকাজ শুরু করে দিতে পারি।

—সুষেণ রায়,
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

শ্মশানে অতিথি নিবাসের সংস্কার প্রয়োজন

বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা পরিচালিত ত্রিবেণী শ্মশানঘাটে অবস্থিত অতিথি নিবাসটি অযত্ন, অবহেলা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পর্যটকদের কাছে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। অথচ পৌর কর্তৃপক্ষ এর প্রতিকারে নির্বিকার। এই পত্রলেখক অতিথি নিবাসে দুই দিন বাস করে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তা সকলের অবগতির জন্য তা উল্লেখ করা হলো।

১। অতিথি নিবাসে সিঁড়ি এবং ছাদে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। ফলে চলাফেরায় খুবই অসুবিধা হয়।

২। পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই।

৩। শৌচাগার অপরিচ্ছন্ন এবং অস্বাস্থ্যকর।

৪। ঘরের দরজা এবং জানলার ছিটকিনি ভাঙা থাকায় ঠিকমতো খোলা বা বন্ধ করা যায় না।

৫। বিছানা এবং শয্যাসামগ্রী অত্যন্ত জীর্ণ ও মলিন।

৬। ঘর নিয়মিত পরিষ্কার হয় না।

বাঁশবেড়িয়া পৌর কর্তৃপক্ষ উপরে বর্ণিত অসুবিধাগুলি নিরসনে সচেষ্ট হলে, অতিথি নিবাসটি ভ্রমণ-পিপাসুদের কাছে আকর্ষণীয় ও ব্যবহার উপযোগী হয়ে উঠবে।

—সপ্তর্ষি ঘোষ,
পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

স্কুলে যৌনশিক্ষা

বর্তমানে একটি বিতর্কিত বিষয় হচ্ছে 'স্কুলে যৌন শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত কিনা?' এই বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা ধরনের মতামত খবরের কাগজে প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছে এবং স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো এখনো সম্ভব হয়নি। সেজন্য এই সুযোগে আমি এই বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

স্বাস্থ্য শিক্ষার মতো যৌন শিক্ষাও শারীর বিজ্ঞানেরই একটা অঙ্গ এবং সুস্থ ও নীরোগভাবে বেঁচে থাকতে এই শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। তবে, স্কুল বা কলেজ কখনোই এই শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান নয়। কারণ, এই শিক্ষা নেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক পরিবর্তন ও প্রয়োজন অনুসারে এই শিক্ষা অত্যন্ত সাবধানে এবং ঘরোয়াভাবে একটু-একটু করে দিতে হয়।

যিনি এই শিক্ষা দেবেন তাঁকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। তাঁকে উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন, অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও সংযমী হতে হবে; নইলে এই শিক্ষার অপব্যবহার কোনোভাবেই ঠেকানো যাবে না, স্কুলের পরিবেশ আরও খারাপ হয়ে যাবে। সেই দিক থেকে বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাই যৌন শিক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপযুক্ত; এমনকী তাঁরা বেশিরভাগই সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবেও অযোগ্য; এঁদের বেশিরভাগই ডিগ্রীর জোরে শিক্ষকতার চাকরি করছেন মাত্র, প্রকৃত শিক্ষক বা শিক্ষিকা এখনো হতে পারেননি। ছাত্র- ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকার নানা ধরনের কথাবার্তা, মন্তব্য ও আচরণের প্রকাশ লক্ষ্য করলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা জানা যাবে। এছাড়া বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্র-সমাজ এবং শিক্ষক সমাজের মধ্যে বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও আস্থার সম্পর্ক একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। এমতাবস্থায় স্কুল-কলেজে এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলে সমাজের ভালোর চেয়ে মন্দই হবে। যৌনশিক্ষা দেবার উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে মা আর ছেলেদের ক্ষেত্রে বাবা অথবা উভয় ক্ষেত্রেই মা-বাবা হতে পারেন।

তবে তার জন্য মা-বাবাকে এই শিক্ষার পাঠ অবশ্যই নিতে হবে। অনেক ভুল সিদ্ধান্তে সমাজের নানা ক্ষতি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, আবার যেন আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে

অনুরোধ জানাচ্ছি দেশ ও সমাজ পরিচালকদের কাছে।

—**প্রভাস পাণ্ডে,**
কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

অদক্ষ শ্রমিক এবং এনডিএ সরকার

আপনার ৬৭ বছর ধরে প্রকাশিত স্বস্তিকা পত্রিকার মাধ্যমে আমি দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের নজরে আনার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি। আমাদের এটা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই যে আমাদের দেশে কর্মহীন অর্থে বেকার মানুষ ও যাদের কোনো কাজ দেওয়ার উপায় নেই অর্থাৎ এই শিল্পয়ানের যুগে নির্দিষ্ট কাজের উপযুক্ত দক্ষতা যাদের নেই এদের সংখ্যা কয়েক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন যে-কোনো সরকারকেই বিশেষ করে বিপুল অ-নিয়োগযোগ্য যে জনগোষ্ঠী তাদের দিকে নজর দেওয়া অবশ্যই নিশ্চিত কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এটা করতে গেলেই প্রাথমিকভাবে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি বলে মনে করি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি যে অঞ্চলে থাকি সেখানকার যারা চিরাচরিত প্রথায় আমাদের জুতো মেরামত করে দিত তাদের আর বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। বাজারে আন্তর্জাতিক মডেলের অত্যাধুনিক Reeboke, Adidas ইত্যাদি জুতোগুলি কেনার মতো ক্ষমতা বেশ কিছু লোকের হয়েছে। এই সব পাদুকাগুলি বিশেষ ধরনের মাল-মশলায় তৈরি হওয়ার কারণে অন্তত বছর দুয়েক কোনো মেরামতির দরকার পড়ে না। কাজে কাজেই স্থানীয় চর্মকারের ঘরোয়া (মেশিন ছাড়া) সারাই দক্ষতাও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতি আরও অনেক ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সরকারকে খানিকটা মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টাকে অনুধাবন করতে হবে। নানান পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা, আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনীতে ৩০ লক্ষের থেকেও বেশি লোক নিযুক্ত আছে। এদের সবাইকেই বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট পোশাক পরতে হয়। আমার বিজেপি দলের কাছে অনুরোধ থাকবে তারা সরকারের কাছে এই ইউনিফর্ম শুদ্ধ খাদিতে তৈরি করার প্রস্তাব রাখুক। যাতে সমস্ত উর্দিধারীর ক্ষেত্রেই হাতে তৈরি খাদির উর্দি বা ইউনিফর্মের ব্যবহার বাধ্যতামূলক হয়। হ্যাঁ, এই শুদ্ধ খাদি বোঝাতে আমি Power loom (যন্ত্রচালিত তাঁত) নয়, কেবলমাত্র হস্তচালিত তাঁত বা হাতে বোনা খাদি বোঝাচ্ছি। আরও সহজ করে বললে যে কাপড়গুলি শুধু কে ভি আই সি-এর খাদি ভাণ্ডারে বিক্রি হয়, সুদৃশ্য পাওয়ারলুমগুলির কাপড়ের বিপণিগুলিতে নয়। শুধু এই একটি বিষয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নজর দিলে পাওয়ারলুমের বদলে হাতে তৈরি প্রাচীন খাদির তৈরি ইউনিফর্ম অন্তত সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে চালু করতে পারলে গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ তথাকথিত অদক্ষ শ্রমিকের জীবিকা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্যই এতে হাতে গোনা কিছু শিল্পপতির পকেট অনেকটাই হালকা ঠেকবে। শুরু হিসেবে কাজ তৈরির ক্ষেত্রে আমি বড় শিল্পের আলোচনা করলাম না, কেননা তার নানান সীমাবদ্ধতা-সহ প্রাথমিক শর্তই দক্ষ শ্রমিক। যাদের থেকে দেশে অদক্ষ বা অ-নিয়োগযোগ্যের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। তাই তাদের নিয়ে ভাবনাই অগ্রাধিকারের শীর্ষে।

—**অতীশ ডি মিত্র,**
১০০৪, কাঞ্চনজঙ্ঘা টাওয়ার,
গাজিয়াবাদ।

(বি. দ্র. মূল চিঠিটি ইংরেজিতে হওয়ায় অনুবাদে শব্দার্থের কোনো তারতম্যের দায় সম্পাদকের নয়।)

মেড ইন ইন্ডিয়া

লোহা দিয়ে লোহা কাটার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ক্ষমতায় আসার এক মাসের মাথায় মোদীর মন্ত্রিসভা আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরির জন্য চীনের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করেছেন। ৬৮তম স্বাধীনতা দিবসের সকালে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে ভারতীয় পটভূমিকায় চৈনিক উন্নয়ন ও সংস্কার-এর ভালো দিকগুলো প্রয়োগ করার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। চীনের আসল শক্তি হলো সস্তায় পণ্য উৎপাদন করে তা বিশ্বের বাজারে সাদা-কালো পথে ছড়িয়ে দেওয়া। শুরু থেকে চীনের এই বড় শক্তির বড় মাধ্যম ছিল কম বেতনে প্রাপ্ত শ্রমিক। কিন্তু বর্তমানে সেই দেশে শ্রমিক খরচ (বেতন) অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গরম লোহার ঠিক এইখানে ঠিক সময়ে নরেন্দ্র মোদী তাঁর হাতুড়ি মেরে দিতে চান।

—**অমিত ঘোষ দস্তিদার,**
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৮ আগস্ট 'চিঠিপত্র' বিভাগে অচিন্ত্য বিশ্বাসের 'কৌলাচার' চিঠিতে ভুলবশত প্রত্যভিজ্ঞ বিমর্শিমী ছাপা হয়েছে। এটা হবে বিমর্শিনী। চুলা ছাপা হয়েছে, সেটা হবে চুন্দা। খাদিরবর্ণী তারা ছাপা হয়েছে, হবে খদিরবনী তারা। শৈরাত্মা ছাপা হয়েছে, হবে নৈরাত্মা। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

—সম্পাদক।

তর্পণ

অসিত বরণ চট্টোপাধ্যায়

তর্পণ কি?

তর্পণের কথা বলার আগে অভিধানে শব্দটির অর্থ যেমন লেখা আছে, তা পর পর তুলে দিই। লেখা আছে— তৃপ্তিকরণ, তৃপ্তিজনন, পিতৃযজ্ঞ, পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে জলদান— এই অর্থগুলির মধ্যে প্রথম দু'টি সজীব ইহজগতের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু যখনই তর্পণ বলছি তখনই তা ইহলোক ছেড়ে পরলোককে নির্দেশ করে, অনেকটা ব্যাকরণের যোগরূঢ় শব্দের মতো। হিন্দুর অবশ্য কর্ম পাঁচটি মহাযজ্ঞ, যথা— ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। পিতৃযজ্ঞ ছাড়া আর সবগুলিই আমরা কমবেশি পালন করি। কিন্তু পিতৃযজ্ঞ সকলে করেন না। পিতৃযজ্ঞ হলো পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ বা অপর্ণাদি ক্রিয়া। দেখা যাচ্ছে, এই জগতে থেকে অন্যলোকের অধিবাসী পিতৃগণকে স্মরণ করে জলদানই তর্পণের মূল উদ্দেশ্য। ইদানীংকালে খ্যাতনামা পরলোকগত মানুষের স্মরণ, মনন, কীর্তন বা জীবন আলোচনাকেও স্মৃতি তর্পণ বলা হয়ে থাকে— তর্পণের মধ্যে স্মরণ মনন ব্যাপারটাই প্রধান সন্দেহ নেই। কিন্তু তর্পণ বলতে এক সঙ্গে যা বোঝায় তা হলো স্মরণ মননের সঙ্গে মৃতের উদ্দেশে জলদান।

তর্পণ কেন?

বস্তুনিষ্ঠ ঐহিক যুক্তিবাদী যাঁরা, তাঁদের ঝুলিতে তর্পণকে অস্বীকার করার মতো অনেক উপকরণ আছে। তাঁরা প্রায়ই বলে থাকেন, মরা গোরু কি ঘাস খায়? তাঁরা বলেন, যে দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার উদ্দেশে জল দেওয়ার অর্থ জলেই জল দেওয়া। মরার পরে আর কিছু থাকে না। অতএব 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'— এই ভারতেই চার্বাক দর্শন এই কথা প্রচার করছে। এ প্রসঙ্গে ছোটবেলায় পড়া একটি কাহিনী মনে পড়ে। সকলের জানা দুর্গাপূজার ঠিক আগের কৃষ্ণপক্ষকে বলা হয় পিতৃপক্ষ। পিতৃপক্ষের শুরু থেকেই বিশ্বাসী মানুষ পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দেয় কেউ বা তর্পণ করে। অনেকে আছেন এই পক্ষের প্রতিদিনই তর্পণ করেন। শেষ দিন অর্থাৎ অমাবস্যাকে মহালয়া বলা হয়। এইদিন গঙ্গা-সহ প্রায় সমস্ত নদ নদীর তীরে তর্পণ অনুষ্ঠান হয়। এমনি এক মহালয়ার যোগে অসংখ্য মানুষ যখন তর্পণ করছেন তখন একটি পরলোক অবিশ্বাসী মানুষ গঙ্গায় নেমে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে তীরের দিকে ছুঁড়ে ফেলছে। একজন কৌতূহলীর চোখে এ

দৃশ্য পড়তে তাকে প্রশ্ন করল কেন সে এমন করছে। উত্তরে লোকটি বলেছিল— আমার বাড়িতে একটি শাকের তলা আছে আমি এখান থেকেই তাতে জল দিচ্ছি। স্বভাবতই লোকটিকে পাগল বলার জন্য সে উত্তর দিয়েছিল— এখান থেকে যদি পরলোকে জল যেতে পারে, আমার এ জল শাকের তলায় যাবে না কেন? কাহিনীটি পড়ার পর খুব মজা পেয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, লোকটির যুক্তিকে সেই বয়সে তারিফও করেছিলাম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরলোক বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে নানা বই পড়ে এবং অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে, সেই সঙ্গে আপাত কার্যকারণহীন অনেক ঘটনা ঘটতে দেখে মনে হয়েছে পরলোক আছে। শুধু আছে নয় স্বমহিমায় আছে। ইহলোকের সঙ্গে তার নিরন্তর যোগাযোগ আছে। কেবল আমাদের জানা নাই তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার পদ্ধতিটি কি?

পরলোক যে আছে তা জানতে হলে আগে জানতে হবে মৃত্যু কি? কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শাস্ত্র সমূহ মৃত্যু সম্বন্ধে ভুরি ভুরি কথা বলছে। এত শাস্ত্রীয় কথার ব্যবহার না করে চোখ কান খোলা রেখে মৃত্যু কি তা যতটুকু জানা যায় তাতেই আমরা তর্পণের প্রয়োজন বুঝতে পারব।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এক কথায় বলি জীবনযাত্রা। এখানে যাত্রা কথাটি লক্ষণীয়। সাধারণ অর্থে যদি একে 'চলা' ধরে নিই তাহলে মৃত্যু কি চলার সমাপ্তি? কোনো হিন্দু কিন্তু তা স্বীকার করে না। জন্মের পর মৃত্যু হলেও আবার জন্ম হবে আবার মৃত্যু অর্থাৎ অফুরান চলা। এ যাত্রা যেন চিরন্তন। এটাই পুনর্জন্মবাদ। হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের মূল স্তম্ভ। এমনও দেখা গেছে যারা শ্রাদ্ধ তর্পণে বিশ্বাস করে না তারা পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করে। তারা গীতার 'বাসাংসি জীর্ণানি' মানে, 'ঊর্ধ্বং গচ্ছতি স্বত্ত্বস্থা' মানে, পাপ ও পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তাকে আবার মর্তে আসতে হয় এটাও মানে, কিন্তু তর্পণ বা শ্রাদ্ধের কোনো উপযোগিতা নেই, এ বিশ্বাসও তাদের মধ্যে আছে। তাদের যে বিশ্বাস তা তাদেরই থাক, আমরা দেখি একটা মানুষ কীভাবে মরছে। ঋষি কথন বা শাস্ত্রবচন যাই বলি না কেন তাঁদের প্রত্যেকের একমত যে, মানুষের এই স্থূল শরীর মধ্যেই আরও দু'টি শরীর মিশে আছে। তার একটির নাম সূক্ষ্ম

শরীর, অন্যটি কারণ শরীর। তর্পণ কেন করব— এর উত্তরে সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্বটি জানতে হবে। স্থূল শরীরের কার্যেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থূল চোখে দেখা গেলেও এর কাজ কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে মস্তিষ্কের ভেতরে অবস্থিত শিরা উপশিরাগুলি দিয়ে হয়। যে কথা কানে শুনলাম, যে দৃশ্য চোখে দেখলাম, বাইরের কান চোখ কেবল প্রেরকের মতো নিজ নিজ কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়, মানুষের মন বুদ্ধি অহঙ্কার সেগুলিকে সংস্কারের সঙ্গে মিশিয়ে কর্মেন্দ্রিয়কে নির্দেশ দেয় তবেই হয় শোনা ও দেখার কাজ। এরকম ঘ্রাণ, স্বাদ গ্রহণ, স্পর্শ সব কিছুই একই নিয়মে চলে। এবার ইহজগতে মানুষ যখন মরছে তার ওই স্থূল যন্ত্রপাতি মনকে আশ্রয় করে বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং এ জীবনে অর্জিত কর্মফল সঙ্গে নিয়ে জীবাত্মায় মিশে। যদিও সঠিক নয় তবু বোঝার জন্য জীবাত্মাকে প্রাণই বলি। এই প্রাণ জীবের কর্ম অনুসারে বিশেষ বিশেষ নাড়ী দিয়ে বেরিয়ে যায়। একেই বলা হয় মৃত্যু। এখানে শেষ বলা হলো না বলা হলো দেহটা ছেড়ে গেল। সে দেহ কেমন? ঠিক মৃত্যুর পর অদৃশ্য অথচ সূক্ষ্মইন্দ্রিয় সম্বলিত একটি দেহ ধারণ করে। তার নাম অতিবাহিক দেহ। এ সময়টা বড় কষ্টের। সদ্য ছেড়ে যাওয়া জাগতিক কামনা বাসনা ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই থাকে কিন্তু গ্রহণ করার কোনো উপায় নেই। সূক্ষ্ম অদৃশ্য কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকলেও মনের প্রভুত্বে পরিচালিত হওয়ার জন্য মনের ক্রিয়া সেখানে একমাত্র ক্রিয়াশীল। ইহজগতের প্রিয়জন যদি স্মরণে মননে তাকে তৃষ্ণার জল দান করে, ক্ষুধার অন্ন দেয় তবে সূক্ষ্ম দেহ পরিতৃপ্ত হয়। মানুষের কর্ম অনুসারে এই অতিবাহিক দেহ যতদিন থাকবে, ততদিনই তার কামনা-বাসনা থাকবে। প্রিয়জন যদি স্মরণে মননে জলের ধারার সঙ্গে তার প্রিয় বস্তু মননের দ্বারা উৎসর্গ করে তবে তার তৃপ্তি হয়। তর্পণের প্রয়োজনীয়তা এই জন্য। জগতে থেকে যাঁরা স্নেহ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে সুখে রেখে গেলেন, তাঁদের পারলৌকিক শান্তির জন্য এটা অবশ্য প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল অতিবাহিক দেহের পর সূক্ষ্মদেহ ধারণ, তারপর কর্মানুসারে স্বর্গে অথবা নরকে গমন, ভোগকাল শেষ হলে আবার জন্মগ্রহণ। এই জন্যই পৃথিবীকে বলা হয় কর্মভূমি, পরলোককে বলা হয় ভোগভূমি।

তর্পণ কেমন করে করব?

শাস্ত্রীয় বিধানে ব্রাহ্মণের প্রতিদিন দিন কৃত্য হিসাবে তর্পণ করা বিধি। অব্রাহ্মণদের জন্য পবিত্রযোগ আগে যেমন মহালয়ার কথা বলা হয়েছে তেমন পুণ্যযোগে তীর্থস্থানে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তর্পণ করার বিধান আছে। গয়া বা বদ্রীনাথে প্রেতশিলা, পুষ্কর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদানের বিধি আছে। ওড়িশার হিন্দু অধিবাসীদের অনেকেই জগন্নাথের সিংহদুয়ারের পর যে সিঁড়িগুলি আছে সেখানে বসে পিণ্ডদান করতে ভালবাসেন। যেখানেই যেমন ভাবেই হোক স্মরণ, মনন ও তর্পণ অকুণ্ঠভাবে হলেই পিতৃগণ তৃপ্ত হন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

নাস্তিক্য ভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বে সুতঃ।

পিবন্তি দেহ রুধিরং পিতরো বৈ জলা বিনা।।

ব্রাহ্মণদের নিত্য তর্পণের একটা ক্রম আছে, যাকে স্তরে বিন্যাস করলে— দেব তর্পণ, ঋষি তর্পণ, পিতৃতর্পণ, বিশ্ব তর্পণ প্রভৃতি পাওয়া যায়। কালের গুণে এখন সবাই নানাভাবে ব্যস্ত। তাই সম্পূর্ণ তর্পণ এখন খুব অল্প ব্রাহ্মণই করে থাকেন। এখনকার পণ্ডিতমণ্ডলী একটি সংক্ষিপ্ত তর্পণ বিধি চালু করেছেন। অনেকে সেটাই অনুসরণ করেন। যাঁরা কিছু না করাটা অন্যায় অথচ কিছু করতেই হয় তাঁরা পিতা, মাতা, পিতামহ, মাতামহ, পিতামহী, মাতামহীর উদ্দেশে তর্পণ করে শেষে 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু' বলে তিনবার জল অর্পণ করে তর্পণ শেষ করেন। ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সবার তৃপ্তি কামনাই তর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

তর্পণ অনুভব।

শরীর তৈরি হয়েছে বাবা-মায়ের থেকে পাওয়া জীবকোষ দিয়ে, তাঁরাও তাঁদের পিতামাতার জীবকোষ থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন। আমরা যখন তর্পণে তাঁদের কথা স্মরণ করি তখন আমি যে ছিন্নমূল কেউ নয়, আমার অস্তিত্ব চিরন্তন--- এই ভাবনাটাও মনে বাড়তি আনন্দ দেয়। এটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো, সম্ভব নয়, নিজস্ব উর্বর অনুভবে এটা বোঝা যায়। ■

নেত্রদান মহাদান

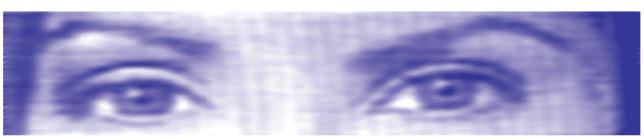

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

বিলুপ্ত বিদ্যা

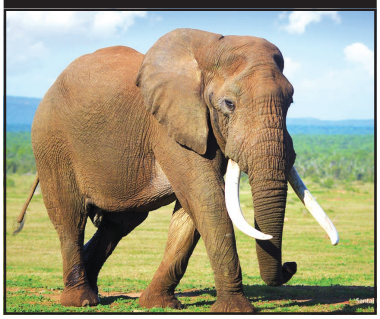

গজশাস্ত্র

নবকুমার ভট্টাচার্য

অমৃত প্রাপ্তির মাহেন্দ্রক্ষণে, সমুদ্র মন্থনে উঠে এসেছিল ঐরাবত। এই শ্বেত হস্তিকেই বাহন করলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। গণেশের মাথায় বসল হাতির মাথা আর লক্ষ্মীর দুই দিকে দেখা গেল হাতিকে। স্কন্দপুরাণের মতে, স্বয়ং শিব হলেন গজান্তক, কারণ গজাসুর নিহত হয়েছে তাঁরই হাতে। দেবর্ষি নারদের অভিশাপে মহেশ নামে এক নরপতি গজযোনিতে মানুষের চেহারা আর হাতির মুখ নিয়ে জন্মেছিল। তারপর দেবতাদের সঙ্গে তার ভয়ঙ্কর বিবাদ শুরু হয়েছিল। শেষে তাঁরই নিধন হলো দেবাদিদেবের হাতে। 'কাশীখণ্ড' মতে গজ নামে একজন অসুরও ছিল। সে হলো মহিষাসুরের পুত্র। মহাভারতের পাতাতেও রয়েছে গজকাহিনী। মহাভারতের যুধিষ্ঠির গোটা সত্যময় জীবনে একটি মাত্র উচ্চারিত মিথ্যায় জড়িয়ে নিলেন হাতিকে। দ্রোণাচার্যকে পুত্রশোকে অস্ত্রত্যাগ করানোর লক্ষ্যে বলে বসলেন— 'অশ্বত্থামা হত, ইতি গজঃ।' মিথ্যার পরিবেশনা যে রণকৌশলের অঙ্গ হতে পারে সেটা হস্তীমূর্খ মানুষ বোধহয় প্রথম শিখল। হস্তী এককালে রাজাদের বিশেষ আদরণীয় ছিল। হর্ষবর্ধনের প্রিয় হস্তী দর্পশাতের বর্ণনা ও তার আবাসস্থলের বর্ণনা আমরা বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত গ্রন্থে পাই। যুদ্ধে, শিকারে, রাজাদের বাহনে সেকালে হাতিই নিয়োজিত হত। মোগল গৌরবের চরমাবস্থায় মাতঙ্গকুলের বিশেষ স্থান ছিল। টিপু সুলতানের প্রিয় হস্তিনী ছিল আয়েদ। ১৭৯৯ সালে বৃটিশরা তার গোড়ালি কেটেও তাকে হাঁটু গেড়ে বসাতে পারেনি। একমাত্র টিপু ছাড়া আর কারও সামনে নতজানু হয়নি সেই হস্তিনী। কাটা গোড়ালির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে মরেছিল আয়েদ।

শুক্রনীতিসার গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হস্তিসমূহ প্রধানত চার জাতিতে বিভক্ত। ভদ্র, মদ্র, মৃগ ও মিশ্র এই চার জাতি। ভদ্র গজগুলির দাঁত মধুর ন্যায় আভাযুক্ত, তারা বর্তুলাকার, বলবান ও সমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যুক্ত। স্থূলোদর, সিংহদৃষ্টি। বৃহৎ চর্ম গলদেশ ও দীর্ঘাবয়ব হস্তীগুলি মদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কণ্ঠ, দন্ত, কর্ণ ও শুঁড় ক্ষুদ্র; চক্ষু স্থূল ও আকারে খর্ব সেগুলি মৃগ শ্রেণীর গজ। এই তিন প্রকার লক্ষণ যদি মিশ্রিত ভাবে কোনো হস্তীতে বিদ্যমান থাকে তাকে মিশ্র মাতলী বলা হয়ে থাকে। এই গজগুলির দৈহিক গড়ন প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে। হস্তীর পরিমাণে আট যবে এক অঙ্গুলি ও ২৪ আঙুলে এক হাত ধরা হয়ে থাকে। ভদ্র গজের উচ্চতা সাত হাত ও দৈর্ঘ আট হাত। উদরের পরিধি দশ হাত। মদ্র ও মৃগের গড়ন ভদ্র হতে এক হাত কম। ভদ্র ও মদ্রের দৈর্ঘ সমান।

হস্তায়ুর্বেদ গ্রন্থে আবার আট প্রকার গজের কথা বলা হয়েছে। সমস্ত দেহ পাণ্ডুবর্ণ, দীর্ঘ, শুভ্র দন্তযুক্ত, অল্প লোমশালী, অল্পভোজী বলে মদবারিসিঞ্চনকারী হস্তী ঐরাবত শ্রেণীভুক্ত। দেহ কোমল দন্ত তীক্ষ্ণ, মদবারি পদ্মগন্ধযুক্ত, জলপানে অত্যধিক ইচ্ছা, পরিশ্রমেও যারা ক্ষীণ হয়ে পড়ে না সেগুলি পুণ্ডরীক নামে পরিচিত। যেগুলির দেহ কর্কশ ও খর্ব, অধিক জলপান করে না, কম লোমশালী, হ্রস্বপুচ্ছ ও কর্ণবিশিষ্ট, সেগুলি বামন নামে পরিচিত। দীর্ঘদেহ, কুদন্তবিশিষ্ট, স্থূলগণ্ড ও মলপূর্ণদেহ যেগুলি কুমুদ নামে খ্যাত। এরা অতিশয় গোপন স্বভাব, অন্য হাতি দেখলেই আক্রমণ করে। অনুপদেশে যাদের উদ্ভব, যারা শীঘ্রগামী তারা পুষ্পদন্ত। মরুপ্রদেশে যারা বিচরণ করে, যাদের মধ্যে গজমুক্তার উদ্ভব, আহার ও পান যাদের সমধিক, দীর্ঘকায় কর্কশদেহ এই সকল গজ সার্বভৌম নামে পরিচিত। যাদের দীর্ঘ শুঁড় ও স্থূল গণ্ড, যারা স্ত্রী গজসমূহে অত্যধিক আসক্ত ও যারা সদা ভক্ষ্যপ্রিয় তারা সুপ্রতীক নামে খ্যাত। যাদের স্নিগ্ধদেহ, শ্রমবিমুখ, স্থূল দন্তবিশিষ্ট তাদের অর্জুন নামে পরিচিত করানো হয়।

আমরা দিগগজের কথা বলে থাকি। এই আটটি দিক গজ কি বিভিন্ন প্রদেশের? গজসমূহের শুভ ও মন্দ লক্ষণ নির্দিষ্ট রয়েছে, যা দেখে রাজন্যবর্গ হস্তী সংগ্রহ করতেন। যাদের তালুতে নীলবর্ণ, জিহ্বাও নীল, দন্ত বক্র, যাদের দন্ত থাকে না, বহুক্ষণ যাদের ক্রোধ থাকে, অনিয়মিত ভাবে যারা মদধারা বর্ষণ করে, যাদের পিঠ কম্পন করে তারা অশুভ লক্ষণের হস্তী। এর বিপরীত লক্ষণ যাদের তারা শুভ। যাদের ভ্রূ ও গণ্ড বিশাল, যাদের গতি উত্তম তারাই শুভ লক্ষণশালী। ভোজরাজ হস্তী শুভ-অশুভ লক্ষণের বিবরণ দিয়েছেন। ভোজরাজ লিখেছেন, মানুষের মাথা ব্যাধি হয় গজসমূহের তা হয়ে থাকে। তাদের চিকিৎসা মানুষেরই অনুরূপ। কেবলমাত্র পরিমাপ বেশি। গজসমূহের রোগ নিবারণ জন্য বিবিধ উপায় গরুড়পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। হস্তীগণের মদাবস্থা কি? জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' এ বলেছেন হস্তীর রগ ফাটিয়া যে পটকিলা বর্ণের উৎকট গন্ধযুক্ত জলস্রাব হয় তাকেই 'মদ' বলে। বানভট্ট হর্ষচরিতে হস্তীর মদাবস্থার পঞ্চদশার উল্লেখ করেছেন। মদগন্ধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে— 'মালতীমুক্ত পুংনাগবকুলোপম সৌরভম্...'। সেকালে হস্তী যে আদরণীয় ছিল তা চাণক্য উল্লেখ করেছেন।

কামন্দক নীতিসার গ্রন্থে হস্তীই প্রধান যুদ্ধোপকরণ বলা হয়েছে। একমাত্র উত্তমগজ শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করতে সমর্থ। তবে আজ সে সবের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আজ হস্তীকে কীভাবে পোষ মানাবে, কী খাওয়াবে সে সবের জানার প্রয়োজন পড়ে না। পলাকামার 'হস্ত্যায়ুর্বেদ আর নীলকণ্ঠের' মাতঙ্গলীলা' পড়ার আর প্রয়োজনও হয় না। আজ গজশাস্ত্র বিলুপ্তবিদ্যা মাত্র। ■

এই সময় এবং আমরা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন সব আরো গুলিয়ে যাচ্ছে। জীবন যত এগিয়ে চলেছে, ততই কানে আসছে সমস্যা, সমস্যা, সমস্যা। হাজার রকমের যত সব সমস্যা। এবং মজার ব্যাপার হলো, প্রত্যেক সমস্যার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে, কলেজ-পাঠ্য পুস্তকের মেড ইজির মতন, তার সমাধানের রবও চারদিক থেকে উঠছে। একটা সমস্যার মীমাংসার জন্যে দশটা সমাধান দশদিক থেকে সাধারণ মানুষকে তেড়ে আসছে। এবং একটা সমস্যার যদি দশটা সমাধান দশদিক থেকে একসঙ্গে এসে জোটে, তাহলে সমাধানই সমস্যার চেয়ে জটিল হয়ে ওঠে।

ঠিক আজ তাই হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনে সমস্যা আর সমাধানের ব্যাপারে। জানি না, এমন বিচিত্র গোঁজামিল আর কোনো যুগে সাধারণ মানুষকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করেছিল কিনা। আজ মানুষের এত সমস্যা আর তার সমাধান এত বহু আর এত বিচিত্র যে কোন্‌টা সমাধান তা চেনবার উপায় পর্যন্ত নেই। এই মারাত্মক মানসিক অরাজকতা হলো আজকের যুগে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় বিপদ। যে মানুষ চোরাবালিতে পা দেয়, সে যেমন তা থেকে মুক্ত হবার যত চেষ্টা করে, ততই নিজের চাপে চোরাবালিতে আরো ডুবে যায়। তেমনি আজকের সাধারণ মানুষ এই মানসিক অরাজকতার ভয়াবহ চোরাবালিতে পড়ে গিয়ে প্রতিদিন অসহায় ভাবে আরো ডুবে যাচ্ছে।

যতদিন যাচ্ছে ততই দেখছি এই ভয়াবহ মানসিক অরাজকতার কাছে আমরা এমন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে চলেছি যে, তার ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমাদের বোধ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। অনেক বাড়িতে দেখেছি, আপনার জন কেউ পাগল হয়ে গিয়েছে, তাকে বাড়িতেই রেখে দিতে হয়েছে। বাড়িতে থাকতে থাকতে প্রতিদিন সেই পাগলকে চোখের সামনে দেখতে দেখতে, সেই বাড়ির লোকেরা ক্রমশ সেই পাগলের অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যায়। সে যদি উলঙ্গ হয়েও বেড়ায়, বাড়ির কারোর চোখে তখন আর বিসদৃশ লাগে না। কিন্তু হঠাৎ যদি বাইরে থেকে কেউ সে বাড়িতে এসে সেই দৃশ্য দেখে সে হয়তো সেই অস্বাভাবিকতায় আঁতকে উঠবে। আজ মনে হয়, আমাদের সমস্ত দেশ যেন সেই পাগলা-বাড়িতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে উলঙ্গ যে পাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে তার বিসদৃশ অস্বাভাবিকতা বাড়ির লোকেদের চোখেই পড়ছে না। বাইরে থেকে কেউ যদি আজ আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের মনের চেহারা দেখতে পায়, তাহলে সে বুঝতে পারবে, কি উন্মাদ অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আমরা ডুবে আছি।

আজকের রাত্রির এই নিঃসঙ্গ নির্জনতায় আমার চোখের সামনে যেন দেখছি আমার জাতি সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক উন্মাদের মতন ছুটে চলেছে। মনে পড়লো সত্যিকারের এক উলঙ্গ উন্মাদের গল্প। মানুষ দেখলেই সে উলঙ্গ এমনি ছুটতে আরম্ভ করতো। একদিন তাকে একজন জিজ্ঞাসা করে, 'আরে পাগলা ছুটছিস কেন?' উলঙ্গ উন্মাদ জবাব দিল, 'কাপড় কেড়ে নেবে যে!'

ছুটে পালাবার পক্ষে একটা ভালো যুক্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গোলমাল শুধু তার পরনে কাপড় নেই সে বোধ তার নেই।

সংকলন : কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

রঙ ভরো

প্রশ্নবাণ

১. গঙ্গা নদীর যাত্রা কোথা থেকে কোথায়? কটি রাজ্য পেরিয়েছে?

২. গঙ্গা কত কিলোমিটার পথ পেরিয়েছে? কোথায় গিয়ে মিলিত হয়েছে সাগরের সঙ্গে? সাগরের নাম?

৩. গঙ্গাতীরে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা কত? কটি বড়ো শহর, কটি ছোট শহর গঙ্গাতীরে গড়ে উঠেছে?

৪. শব্দ দূষণ হচ্ছে কীভাবে?

৫. গঙ্গা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগ কবে? উদ্দেশ্য কি? উদ্যোগী ছিলেন কে?

উত্তর : ১. গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর। পাঁচটি। উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ। ২. ২৫২৫ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গে। বঙ্গোপসাগর। ৩. প্রায় ৩৪ কোটি। ৫০টি বড়ো শহর। ৫০টি ছোট শহর। ৪. প্রতিটি রাজ্যে নদীতে বর্জ্য তরল পদার্থ ফেলা হচ্ছে। ৫. ১৯৯৬। গঙ্গার উন্নয়ন ও দূষণ প্রতিরোধ। সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

ছবিতে তফাত খোঁজা

এসো আবার পড়ি

প্রভাতী

নজরুল ইসলাম

ভোর হোলো দোর খোল খুকুমণি ওঠো রে!
ওই ডাকে যুঁই শাখে ফুল খুকি ছোটরে।
খুকুমণি ওঠো রে।
রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ওই!
দারোয়ান গায় পান শোন ঐ 'রামা হৈ!'
ত্যজি নীড় করে ভিড় ওড়ে পাখি আকাশে
এন্তার গান তার ভাসে ভোর বাতাসে।
চুলবুল বুলবুল্ শিস দ্যায় পুষ্পে,
এইবার এইবার খুকুমণি উঠবে।
খুলি হাল তুলি পাল ওই তরী চললো,
এইবার এইবার খুকু চোখ খুললো।
আলসে নয় সে ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই চাঁদাভাই টিপ দেয় কপালে।
উঠলো ছুটলো ওই খোকাখুকি সব,
'উঠেছে আগে কে' ওই শোনো কলরব।
নাই রাত, মুখ হাত ধোও, খুকু জাগো রে,
জয়গানে ভগবানে তুষি বর মাগো রে!

রামায়ণের সীতা—আজকের নারী

সুতপা ভড়

আজকের ভারতীয় নারী নিজ কর্তব্য পালনে সর্বদা তৎপর, দৃপ্ত কিন্তু কখনও বা বিভ্রান্ত। সর্বস্ব দিয়েও পরিবারের সব সদস্যকে খুশি করতে কখনও কখনও সে অপারগ। এই অসহায় সর্বনিবেদিত প্রাণীটিকে কেউ বোঝার চেষ্টাটুকু করে না। অথচ পরিবারের প্রত্যেকের চাহিদা প্রধানত এই প্রাণীটিকে কেন্দ্র করেই। বয়োজ্যেষ্ঠরা সেবা চান, সন্তানরা চায় মা'র বাৎসল্য এবং স্বামী তার প্রভুত্ব বজায় রাখতে সদা তৎপর। আর মহিলাটির অবস্থা অদ্ভুত। নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করতে করতে সে নিজেকে খুঁজে পায় ত্রেতাযুগের সর্বত্যাগী সীতার মধ্যে। নিজেকে বর্তমান যুগে সীতার প্রতিভূরূপেই দেখে। এখানেই রামায়ণের সার্থকতা প্রচণ্ডভাবে বিরাজমান আজকের এই আধুনিক জীবনধারায়। সেজন্য আজকের মহিলারা নিজেদের সঙ্গে সীতাকে অভিন্ন দেখেন। আসুন, একবার ছোট্ট করে সীতার জীবনকে দেবীরূপে নয়, বরং এক মানবীরূপে দেখি। সত্যিই কি তিনি আমাদের থেকে একেবারে পৃথক— না তাঁর জীবনের নানা বাঁকে আমরা আজকের নারীকেই খুঁজে পাই।

জন্ম থেকেই দেখি সীতা স্বতন্ত্র রাজমহলে তিনি জন্ম নেননি— জন্ম তাঁর মাটিতে। ধরিত্রীর কন্যা তিনি। রাজা জনক পুত্রীরূপে বরণ করে নেন তাঁকে। রানী সুনয়না ধন্যা হন সীতারূপী কন্যাপ্রাপ্তিতে। নিজের মতো করে সাংসারিক বিদ্যাদানে তিনি সীতাকে শ্রেয়া করে তোলেন। সীতার রন্ধনকলা কুশলতার প্রমাণস্বরূপ— 'সীতা কি রাসোই' আজও অযোধ্যায় বিদ্যমান। অপরদিকে, পিতা রাজর্ষি জনক তাঁকে বিদ্যাবুদ্ধি আর জ্ঞানীজন সংসর্গে করে তোলেন বিদুষী। রামায়ণের পৃষ্ঠায় আমরা সীতাকে তৎকালীন মুনিগৃহে অনায়াস বিচরণ করতে দেখি। ঋষিগণ এবং ঋষিপত্নীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ তাঁকে পরিপূর্ণ করে তোলে। আশ্রম পরিবেশে থাকাকালীন প্রকৃতির প্রতি এক গভীর টান তিনি অনুভব করেন। তিনি তো ধরিত্রীর কন্যা— প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নিজেকে চিনে নিতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। নিজেকে যুগানুকূল এবং পরিবেশানুকূল করে তোলেন তিনি। আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মরক্ষায় পারদর্শিনী সীতাকে হরধনু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন পিতা জনক। হরধনু দশ ব্যক্তি মিলেও ওঠাতে অপারগ ছিল। অথচ সীতা অবলীলায় তার স্থানান্তরণ বা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

স্বয়ংবর সভায় শ্রীরামচন্দ্রের আগমন, হরধনু ভঙ্গ এবং সীতার শ্রীরামকে স্বামীরূপে বরণ তো বিধাতা নির্দিষ্ট ছিল। বিবাহোপরান্তে, শ্রীরাম লক্ষ্মীস্বরূপা সীতার কাছে নিজেকে এক পত্নীত্বের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করলেন। এরপর খুব শীঘ্রই দেখি শ্রীরামের পিতৃসত্য পালনের জন্য সীতা স্বামীর অনুগামিনী। নিজ দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর। সেজন্য প্রাসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে অরণ্যগমনে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

অরণ্য বসবাসকালে যেখানেই শিক্ষার সুযোগ এসেছে তা গ্রহণ করেছেন। পেয়েছেন ঋষি এবং ঋষিপত্নীদের (অনসূয়া, গার্গী) আশীর্বাদ ও শুভকামনা। অরণ্যে থাকাকালীন রঘুকুলের মর্যাদা রক্ষার্থে লক্ষণরেখা অতিক্রম করে সন্ন্যাসীরূপী রাবণকে ভিক্ষাদান করেন। দুর্বুদ্ধি রাবণ তাঁকে অপহরণ করলে পুনরায় তিনি উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেন। নিজ গাত্রঅলঙ্কার ছড়িয়ে স্বামীকে পথনির্দেশ দিলেন। অশোক কাননে তাঁকে বন্দী করলেন দশানন। কিন্তু নিজের করতে পারলেন না অসীম শক্তির অধিকারিণীকে। পবননন্দন শ্রীহনুমানের বীরত্বের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা সত্ত্বেও অপেক্ষা করেছেন স্বামীর জন্য। যথাসময়ে রঘুনন্দন শ্রীরাম এসে সীতাকে উদ্ধার করেছেন।

কিছুদিন পর আবার অরণ্যজীবন। লক্ষ্মণ সীতাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করতে গেলে অনুতপ্ত লক্ষ্মণকে সীতার সান্ত্বনা তিনি স্বয়ং প্রকৃতির কন্যা। সুতরাং প্রকৃতিতে তিনি সহজ। কেউ তাঁকে রিক্ত করতে পারবেন না। মর্যাদাপুরুষোত্তম স্বয়ং রামচন্দ্রও নন। আবার একাকী অরণ্যবাসকে তিনি মেনে নিয়েছেন— প্রকৃতির কাছে করেছেন আত্মসমর্পণ। আমরা দেখি প্রজাবৎসল সীতা নিজেকে উজাড় করে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন। সীতার এই রূপ তো পূর্বে দেখিনি। এখন তিনি কেবল স্বামী পরিত্যক্তা নন। বরং প্রকৃতির কন্যা হিসাবে বাল্মীকির আশ্রমে অনায়াসে নিজেকে মানিয়ে নিলেন। এখানে তিনি স্বামীর থেকে অনেক উঁচুতে নিজের স্থান করে নেন। যথাসময়ে নিজ সন্তানদের জন্ম দেন এবং রঘুকুলানুযায়ী তাদের পালন পোষণ ও স্বাবলম্বী করে তোলেন।

জীবনের কার্যশেষে নিজের অদৃষ্টকে নিজেই বেছে নিলেন সীতা। রামায়ণের এই সীতাকে দেখি এক সেবাপরায়ণা, কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী হিসাবে। কিন্তু স্বামী-মুখাপেক্ষী নন তিনি। তিনি ঈশ্বরে আশ্রয়ী, আত্মবিশ্বাসী মাতা ধরিত্রীর কন্যা। কার্য সমাপনে মাতৃক্রোড়েই নেন চিরবিশ্রাম। মর্যাদাময়ী রাজকন্যা, রাজমহিষীর এই অসামান্য জীবন আজকের যুগেও অনুপ্রেরণাদায়ী। ভারতীয় নারীকে দেয় সঠিক পথে চলার দিশা। বর্তমান নারীর জীবন মসৃণ নয়। কণ্টকময় পথে চলতে চলতে কখনও বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন। হারিয়ে ফেলেন দিশা, গতি। সেক্ষেত্রে সীতার জীবন তাঁদের কাছে একমাত্র দিশারি, আত্মনির্দেশিত কিন্তু আত্মমর্যাদায় পরিপূর্ণ এক নারীর জীবন, অন্য নারীদের দেয় নতুন আলো। সেই আলোতেই চলার পথ খুঁজে পাবেন আজকের ভারতের নারী।

হিন্দি-জাপানি ভাইভাই

আবে ও মোদীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতাই এশিয়া ভূখণ্ডে এক দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের ভিত গড়ল

অতিথি কলম

ব্রহ্মা চেলানী

জাপান যে ভাবে নিজেকে ছাপিয়ে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সাদরে গ্রহণ করল সাম্প্রতিক অতীতে কোনো বিদেশি অতিথির ক্ষেত্রে তা বিরল। জাপানি প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবে সমস্ত কূটনৈতিক আদবকায়দাকে উড়িয়ে দিয়ে জাপানের প্রাচীন শহর কিয়তোয় গিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে শুধু উষ্ণ অভ্যর্থনাই করলেন না সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজকীয় শহরে সাপ্তাহান্তিক ছুটিও কাটালেন দু'জনে।

> টোকিও যখন ভাবছে— দিল্লীই হতে পারে তার অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের চাবিকাঠি ঠিক তখনই ভারত ভাবছে জাপানই হবে মূলধন ও বাণিজ্যিক কৃৎকৌশলের উৎস যা দিয়ে দেশের পরিকাঠামো ও উৎপাদন ক্ষেত্রকে এগিয়ে নেওয়া যায়।

ভারত ও জাপান তাদের যৌথভাবে আস্থা রাখা যে মূল্যবোধ, তাকে যেমন সারা বিশ্বে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, ঠিক তেমনই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতেও তাদের যৌথ অংশগ্রহণকে সমান গুরুত্বে বিচার করার প্রচেষ্টায় অগ্রসর হতে চায়। অবশ্য ইতিমধ্যেই উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আজ এশিয়া মহাদেশের দুটি দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা দ্রুততম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তকমা পেয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মোদী ও আবে চাইছেন তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠা এই পারস্পরিক সৌহার্দ্যকে সমগ্র এশিয়ার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে। যার ফলে জাপান ও ভারত উভয়ে এশিয়ায় ক্ষমতা ভারসাম্যের নিরিখে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এখানে জাপান ও ভারতের এই পারস্পরিক নৈকট্য সৃষ্টির যৌক্তিকতাটি অত্যন্ত শক্তিশালী। যদি ধরা যায় চীন, জাপান ও ভারতকে নিয়ে এশিয়ায় এক কৌশলগত ত্রিভুজ টানা হচ্ছে সেক্ষেত্রে চীন হবে ত্রিভুজের দীর্ঘতম বাহু 'ক'। আর একটি দিক হবে 'খ' অর্থে ভারত, বাকি বাহুটি অর্থাৎ 'গ' হবে জাপান। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এই কাল্পনিক ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য খ ও গ অর্থাৎ ভারত ও জাপান যোগ করলে অবশ্যই 'ক' অর্থাৎ চীনের থেকে বড় হবে। এখানেই অবিসংবাদিত ভাবে উঠে আসছে ভারত-জাপান সম্পর্কের অমোঘতা। এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করে গড়তে না পারলে এশিয়ায় শুধুমাত্র চীন কেন্দ্রিকতাই প্রাধান্য পেতে থাকবে।

এখানে মনে রাখতে হবে বেজিংকে ভারত বা জাপান কেউই এড়িয়ে চলতে পারবে না। কেননা বেজিং উভয় দেশেরই সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার। এই সম্পর্ককে কোনো দেশই বিঘ্নিত করার ঝুঁকি নেবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এশিয়ার পারস্পরিক ক্ষমতার ভারসাম্যের অনিবার্যতা প্রকট হয়ে পড়ছে। চীনের অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি ও প্রাচুর্যের সুবাদে তারা আজ অন্যান্য পড়শি দেশের ওপর আধিপত্যবাদ বিস্তারে সক্রিয়। তা করতে গিয়ে তারা স্থল ও জল উভয়ক্ষেত্রেই চিরাচরিত নিয়ন্ত্রণ বা অনতিক্রম্য সীমান্তগুলির কোনো পরোয়া করছে না। অনেক সময়ই অন্য দেশের জলসীমায় ঢুকে পড়ছে, কখনও দীর্ঘদিনের স্বীকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা ভেঙে আগ্রাসী ভূমিকায় সক্রিয় হয়ে উঠছে। জাপান ও ভারত— এশিয়ার এই দুই শক্তির পারস্পরিক নৈকট্যে চীনের এই নিষ্কণ্টক উত্থানের বদলে একটা ক্ষমতার ভারসাম্য গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নিশ্চিত।

আবে ও মোদীর ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠার চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত, আদর্শগতভাবে উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক। উভয়েরই জন্ম ৫০-এর দশকে। জ্যোতিষশাস্ত্রীরা বলছেন উভয়েরই রাশিচক্র অনুযায়ী কন্যা রাশির জাতক এবং সবচেয়ে বড় কথা

আন্তরিকভাবেই উভয়ে উভয়কে বিশ্বস্ত বন্ধু বলে মনে করেন। এটার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল দু'জনের দেখা হওয়ার পর। যে ভাবে তাঁরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন তাতে দীর্ঘ অদর্শনের পর দুই বন্ধুর মিলনের হাস্যময় আন্তরিক মুহূর্তটি সারা বিশ্বের চ্যানেলগুলি সানন্দে সম্প্রচার করেছে। আবে-মোদীর এই সখ্য নিজেদের ব্যক্তিগত রসায়ন ও নিবিড় হিসেব নিকেশের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। দু'জনেই চান নিজের দেশের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার ভিত মজবুত করে নিজেদের জাতির স্বাভিমান পুনরুদ্ধার করতে চান। দু'জনে হাত মেলালে যে সেটা সহজ হবে এ ব্যাপারে তাঁরা আত্মবিশ্বাসী।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চালু তত্ত্ব অনুযায়ী দু' দেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) শক্তির ওপর নির্ভর করে। বিশেষত উভয়ের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে হিতকর কিছু নিকষ হিসেব নিকেশের ভিত্তিতে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে ঠিক একইভাবে অনেক সময় বরং নৈর্ব্যক্তিকতাকে ছাড়িয়ে ব্যক্তি সম্পর্কের উষ্ণতার ওপরই ইতিহাস তৈরি হয়েছে। অবশ্যই একটি বস্তু 'কমন' ছিল জাতীয় নিরাপত্তা ও সম্মান।

আবের চোখে জাপানের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতই হতে পারে যোগ্যতম বিকল্প। চালু থাকা আমেরিকা নির্ভর যে ধাঁচা রয়েছে তার পরিবর্তন দরকার। অন্যদিকে 'পুবে তাকাও'-এর যে ঘোষিত নীতি ভারতে রয়েছে তাকে হাতে কলমে প্রয়োগ করতে গেলে জাপানই হতে পারে কেন্দ্রীয় চরিত্র, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। এক্ষেত্রে Abe-nomics ও Modinomics উভয়েরই লক্ষ্য এক ও অভিন্ন পিছিয়ে পড়া বৃদ্ধিকে টেনে তোলা। দেশে উন্নয়ন ঘটানো। এ প্রচেষ্টা সার্থক করতে একজনকে আর একজনের ভীষণ দরকার।

টোকিও যখন ভাবছে— দিল্লীই হতে পারে তার অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের চাবিকাঠি ঠিক তখনই ভারত ভাবছে জাপানই হবে মূলধন ও বাণিজ্যিক কৃৎকৌশলের উৎস যা দিয়ে দেশের পরিকাঠামো ও উৎপাদন ক্ষেত্রকে এগিয়ে নেওয়া যায়।

খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে আবে জোর দিয়েছেন যৌথ আত্মরক্ষার নীতির ওপর। এই ভাবনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাপানের নিজেরই আরোপ করা অন্য দেশে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ রাখার নীতি আবে নিজেই শিথিল করতে চান শুধু ভারতের ক্ষেত্রে। এই সম্ভাবনার ফলে উভয়দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতাই শুধু বৃদ্ধি পাবে না যৌথ উদ্যোগে ভারতে অস্ত্র নির্মাণও শুরু হয়ে যাবে। বলে রাখা ভাল ভারতই জাপানি আন্তর্জাতিক অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় গ্রহীতা হিসেবে পরিগণিত হয়। এফ ডি আই-এর ক্ষেত্রেও জাপানের অবদানই সর্ববৃহৎ। মারুতি, মিতসুবিশি প্রভৃতি উল্লেখ্য। দুটি দেশের আপাত বৈপরীত্যই আজ নতুন অর্থনৈতিক যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দিচ্ছে।

জাপানের রয়েছে অত্যন্ত বৃহৎ ও বিশ্বখ্যাত ভারী শিল্প উৎপাদনের কুশলতা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিষেবা নির্ভর ক্ষেত্রে ভারতের বৃদ্ধি নজরকাড়া। ভারত এক অর্থে Software শিল্পের পুরোধা, তেমনই Hardware এর পুরোধা জাপান। ভারতের রয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক তরুণ কর্মক্ষম শ্রমশক্তি। উল্টোদিকে জাপানের জনসংখ্যা বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বার্ধক্যের পথে চলেছে। জাপানের ভাণ্ডারে রয়েছে বিপুল অর্থনৈতিক কোষাগার ও টেকনোলজিকাল দক্ষতা। সেই জায়গায় ভারতে রয়েছে বিশাল এক বাজার ও বিপুল মানব সম্পদ। এই সূত্রেই ভারতকে এক শক্তিশালী ও অর্থনৈতিকভাবে আরও মজবুত দেশ হিসেবেই দেখতে চায় জাপান। মনে রাখা ভাল, বিগত তিন দশক ধরে চীনকে বিপুল অনুদান, শিল্প বিনিয়োগ ও টেকনোলজি হস্তান্তরের মাধ্যমে জাপান আজ এক অমিত ক্ষমতাশালী দেশ হতে সাহায্য করেছে। অথচ জাপানের এই ভূমিকাই আজ চীন ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায়। এই পটভূমিতেই জাপান আজ ভারতকে চীনের সমতুল অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর এক দেশ হিসেবে দেখতে চাইছে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে এক কথায় ৩৫ বিলিয়ন ডলারের বিশাল অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু চীনের তো কোনো কৌতূহলই নেই ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করার। চীন সদাই বুক বাজিয়ে বলে দিল্লীর সঙ্গে তার বিপুল অর্থের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য চালু রয়েছে। কথাটার মধ্যে ভেজাল আছে। বাস্তবে চীন ভারত থেকে যে টাকার জিনিস আমদানি করে ভারতে রপ্তানি করে তার তিনগুণ অর্থমূল্যের বস্তু। এটি সর্বঅর্থেই বিষম বাণিজ্য। ভারতের রপ্তানি মূলত চীনের কারখানাগুলির জন্য কাঁচামাল পাঠানো অন্যদিকে চীন সব রকমের উৎপাদিত পণ্য ভারতের বাজারে ঠেলে দেয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতে তাদের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (এফ ডি আই) স্বল্পতা দেখলে। বিনিয়োগ নগণ্য। মোদীর কাছে তাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ চীনের সঙ্গে এই প্রায় একপক্ষীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের খোলনলচে পাল্টানো যার ভিত্তিতেই শুধু এগোতে পারে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। যা রাজনৈতিক, সীমান্তকেন্দ্রিক বা জলসীমাকেন্দ্রিক সমস্ত বিবাদের সমাধানের ক্ষেত্রেই একপক্ষীয় না হয়ে যথার্থ অর্থে তুল্যমূল্য অর্থাৎ দ্বিপাক্ষিক হবে। ভারত-জাপান সখ্য চীন কখনই ভাল চোখে দেখবে না। পরিণতিতে তারা দু'দেশের ক্ষেত্রেই সামরিক চাপ বাড়াতে দ্বিধা করবে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিরাপত্তা কাউন্সিলে স্থায়ী সদস্য দেশ বাড়াবার যে প্রক্রিয়া চালু আছে সেখানেও নাক গলিয়ে সদস্যপদ আটকাবার চেষ্টা করবে।

লক্ষণীয়, নেপাল ও ভুটানবাসীকে মোহিত করে দিয়ে অত্যন্ত সাফল্যময় সফরের পর মোদীর এই জাপান সফর। সর্ব অর্থেই এই জাপান গমনকে তিনি ঐতিহাসিক করে দিয়েছেন। গড়ে তুলতে চলেছেন এশিয়ার শক্তিধর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামরিক বিনিময়ের এক নতুন অধ্যায়। অত্যন্ত মজবুত বুনিয়াদের ওপর খাড়া করতে চলেছেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে যার নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ 'Special Strategic and global partnership'। মোদীর এই সফর আগামীদিনে এশিয়া মহাদেশের এই দু'দেশকে বিশ্বের ক্ষমতা-মানচিত্রে যে নতুন মহিমায় স্থাপন করবে তা দেখতে উদগ্রীব ভারত ও জাপানের মানুষ।

(সৌজন্যে : টাইমস)

একটি যুগান্তকারী সংস্কার—প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

'গরিবের জন্য করব'— নরেন্দ্র মোদীর এমন উক্তি ধন্দে ফেলে দিয়েছিল সংস্কারপন্থী তাবড় চিন্তাবিদ্‌দের। এর সঙ্গে তাঁরা কিছুতেই যেন মেলাতে পারছিলেন না মোদীর সংস্কারপন্থী মুখটিকে। সংস্কার নিয়ে দেশজোড়া এত প্রচার করে, এত জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসে মোদী কিনা উল্টোপথে হাঁটবেন। গরিবের জন্য করা মানে সেই তো নেহরুপন্থার সস্তা রাজনীতি— জনগণের করের টাকায় খয়রাতি প্রকল্পতন্ত্র যার বিষে আজ ভারতীয় অর্থনীতি জর্জরিত। ভরতুকি দিয়ে জিনিসপত্রের দাম কম করে দেখানো, সরকারের কাঁধে বিপুল ঋণভার, সামাজিক প্রকল্পের অর্থ নিয়ে নয় ছয়, সবক্ষেত্রে অদক্ষতা, আর্থিক বৃদ্ধির গতি হ্রাস আর সামাজিক অসাম্য— এই তো তার পরিণতি। গরিবের প্রকল্প মানে জনসমাজে এটাই প্রচলিত ধারণা।

কিন্তু গরিবের দেশে গরিবের জন্য উন্নয়ন করার প্রয়োজনীয়তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? কীভাবে এই গরিবগুলোর সত্যিকারের উপকার করা যায়? সেটাই করে দেখাল স্বতন্ত্র বিজেপি সরকার। মোদীজীর প্রসঙ্গ এলেই অনিবার্যভাবে এসে যায় 'সুদক্ষ প্রশাসক'-এর ধারণা।

তবে, প্রশ্ন ওঠে যে আগে যাঁরা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাঁরা কি অযোগ্য, অদক্ষ ছিলেন? দক্ষতা আর যোগ্যতার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফারাক আছে। দক্ষতাও যোগ্যতার একটি মাপকাঠি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যোগ্য মানেই দক্ষ নয়। বরিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদ ড. মনমোহন সিং-এর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যোগ্যতা নিয়ে কারও মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকা উচিত নয়। কিন্তু সত্যই কি তিনি দক্ষ প্রশাসক ছিলেন?

স্বাধীনতার পর প্রায় সাত দশক অতিক্রান্ত হতে চলল, অথচ দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ আজও ব্যাঙ্কিং-এর মতো জরুরি পরিষেবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত! ক্ষমতায় এসে, মাত্র তিন মাসের মাথায়, সরকার এক ঐতিহাসিক 'প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা'র মধ্যে দিয়ে শুরু করলেন গরিব ভারতবাসীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নতুন অধ্যায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনেক আগে পেলেও গরিব ভারতবাসীর ভাগ্যে অর্থনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচন ঘটেনি। তাই প্রকৃত অর্থেই এই পদক্ষেপ যুগান্তকারী।

কি আছে এই জন-ধন যোজনায়? সাধারণভাবে দেখতে গেলে যাদের এখনও ব্যাঙ্কের খাতা নেই তাদেরকে সুলভ শর্তে ব্যাঙ্কে খাতা খুলতে দেওয়া এর উদ্দেশ্য হলেও প্রকৃত অর্থ সমাজের প্রান্তিক লোকগুলিকে ব্যাঙ্কিং-এর আওতায় এনে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া যা এতদিন তাদের কাছে স্বপ্ন ছিল। শুধু তাই নয়, এটি এমন একটি বহুমুখী প্রকল্প যার মাধ্যমে সরকার এক সঙ্গে অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য সাধন করতে চলেছেন।

এবার দেখে নেওয়া যাক সেগুলি কি কি। আজকের দিনে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার মতো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা না পাওয়া মানুষগুলোর পক্ষে জীবনধারণ করাটা খুবই কষ্টকর। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকেদের আয় অল্প ও অনিশ্চিত হলেও তাদের মধ্যে অপরিকল্পিত ভাবে ভোগপ্রবণতা দেখা যায়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী তাঁদের সমীক্ষায় বার বার দেখিয়েছেন যে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এদের অচেতনতা এবং সঞ্চয়ের সঠিক জায়গার অভাবে তাদের সঞ্চয় প্রায় নেই বললেই চলে। আর এই প্রবণতাই তাদের আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর করে রেখেছে। রোজগারে টান পড়লেই বাঁচার জন্য এদের ধার করতে হয়। গরিব মানুষগুলোর যেখানে কম সুদে ঋণ দরকার, সেখানে তাদেরকে বহুগুণ বেশি সুদে মহাজনের কাছে ঋণ নিতে হয়। তারপর ঋণের বোঝায় আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে হয়। অর্থের অভাবে শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, এরকম সমাজজীবনের বহু সুবিধা থেকে তারা বংশপরম্পরায় বঞ্চিত হন। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে এদের রেহাই নেই। তাদের এই দুর্বলতার সুযোগে দেশজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য প্রতারক সংস্থা। এইসব সংস্থায় টাকা জমিয়ে বহু গরিব পরিবার আজ পথে বসেছে। প্রধানমন্ত্রীর এই পরিষেবার মাধ্যমে গরিব মানুষেরা যেমন তাদের অর্থের পাশাপাশি সুদ পাবেন, তেমনি গ্রামাঞ্চলে এইসব ভুয়ো অর্থলগ্নির সংস্থাগুলি জনপ্রিয়তা এমনিতেই কমে যাবে। অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও অশিক্ষিত লোকেরা ব্যাঙ্কে খাতা খোলার জটিলতার ভয়ে পিছিয়ে যান। জন-ধন যোজনায় খাতা খোলার প্রক্রিয়াকে সরল করা হয়েছে। শুধু একটি ছবি-সহ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির সামনে সই করলেই খাতা খুলে যাবে। বাকি দরকারি নথিপত্র (কে ওয়াই সি) ছয় মাসের মধ্যে জমা দিলেই চলবে। সেসব না দিতে পারলেও খাতা এক বছর চালু থাকবে। আর এই নথিপত্রের

নবকুমার ভট্টাচার্যের

দুর্গাপুজোর জোগাড় - ৬০৲

দুর্গাপুজোর নিয়মকানুন - ৬০৲

দুর্গোৎসব : বোধন থেকে বিসর্জন - ২০০৲

প্রাপ্তিস্থান

পুস্তক বিপণী

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

(বয়স, ঠিকানা প্রভৃতির প্রমাণপত্র) জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু এখনও হাতে পাননি বলে জানালে খাতা আরও এক বছর চালু থাকবে। এর আগে সবশ্রেণীর মানুষের নাগরিক প্রমাণপত্র করাতে সরকার বহু টাকা ব্যয় করেছে, কিন্তু আজও অনেক নাগরিকেরই পরিচয়পত্র নেই। এবার এই লোকগুলি নিজেদের তাগিদেই সেটা করিয়ে নেবেন। অনেক সময়ই বলা হয় যে শুধু আইন করে ভুয়ো লগ্নি সংস্থাগুলিকে ঠেকানো মুশকিল। যতক্ষণ না গরিব মানুষগুলোকে সঞ্চয়ে সুরক্ষা দেবার পাশাপাশি সঞ্চয় সচেতনতা বাড়ানো যাবে, ততক্ষণ প্রতারকরা গরিবদের দুর্বলতার সুযোগ নিতেই থাকবে। তাই এই প্রকল্প এদের বিরুদ্ধে এক প্রকার পরোক্ষ পদক্ষেপ বলে ভাবা যেতে পারে। জীবনবিমার ধারণাটি এদেশে পুরনো হলেও

গরিবের সুদিন

 সারা দেশ জুড়ে ২০ জন মুখ্যমন্ত্রী ও বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দ্বারা ৭৬টি কেন্দ্রে গরিব মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার মতো একই ধরনের দৈত্যাকৃতি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

 সব মিলিয়ে প্রথম দিনেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে ৬০০টি কার্যক্রম ও ৭৭,৮৫২টি শিবির আয়োজিত হয়েছে।

 আগামী বছরের ২৮ জানুয়ারির মধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় অন্তত সাড়ে সাত কোটি মানুষ আসবেন, যাঁদের ব্যাঙ্কে 'জিরো ব্যালেন্স' অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ ও সেইসঙ্গে ডেবিট কার্ড দেওয়া হবে।

 ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত সাধারণ বিমা ও ১ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমার সুযোগ দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে ওইসব গরিব অ্যাকাউন্ট ধারকরা ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত 'ওভার ড্রাফট'-এরও সুযোগ পাবেন।

গ্রামাঞ্চলে এর প্রসার নিতান্ত অপ্রতুল। সম্প্রতি বিমা নিয়ামক সংস্থা (আই আর ডি এ) গ্রামাঞ্চলে বিমার সুবিধা প্রসারে অনেক পদক্ষেপ নিলেও বাস্তবে কিন্তু পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই আয়ের অনিশ্চয়তা এবং বিভিন্ন প্রমাণপত্রের অভাবে এরা বিমা করতে পারে না, অথচ এদেরই বিমার দরকার সবচেয়ে বেশি। এই প্রকল্পের আওতায় এখন নতুন খাতার সঙ্গে উপহারস্বরূপ মিলবে এক লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা ও ত্রিশ হাজার টাকার জীবন বিমা। থাকবে ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে যে কোনো এটিএম থেকে টাকা তোলার সুযোগ। কোনো ন্যূনতম অর্থরাশি জমা রাখার আবশ্যকতা নেই। খাতাগুলি সন্তোষজনক ভাবে চালানোর পর মিলবে জমাতিরিক্ত অর্থ তোলার সুযোগ, সুলভ শর্তে ঋণ ও পেনশন। আর চাইলে একশ দিনের কাজের মতো সরকারি যোজনার টাকা সরাসরি খাতায় জমা হবে। ব্যাপারটা একবার ভাবুন তো, কি বিশাল কর্মকাণ্ড! ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানির কাজের পরিধি একটি শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে। লাভবান হবে ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানিগুলি। বিশেষ করে সুবিশাল কৃষক সমাজের আয়ের একটা অংশ যদি এদের ব্যবসায় নিবিষ্ট হয়, তবে ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানিগুলিকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। একাজে নামার আগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে, এর জন্য 'মোবাইল ব্যাঙ্ক' পরিষেবা চালু করাটা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সাধারণ মোবাইলেই সেই সুবিধা দিতে হবে। গত দু'মাসে 'ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন'- এর সঙ্গে ১০টি মোবাইল সংস্থা এই পরিষেবা দেবে বলে চুক্তি সই করেছে। এককথায় ব্যাঙ্ক, বিমা, মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির ব্যবসা বাড়বে, ফলে লাভ বাড়বে। এত বিশাল পরিষেবাক্ষেত্রে প্রচুর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ও উচ্চবিত্তের ভোগ ব্যয় নির্ভর না হয়ে, সর্বজনীন ভোগ ব্যয় নির্ভর হবে। এই বৃদ্ধি হবে স্বাস্থ্যকর ও স্থিতিশীল।

পরিকল্পিত সঞ্চয়ের অভাবে গরিব মানুষগুলোর প্রায়শই সন্তানদের শিক্ষা, গৃহনির্মাণ, মেয়ের বিয়ে, বীজ-সার, যন্ত্র ইত্যাদি কিনতে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে হাত পাততে হয়। এবার থেকে আর্থিক দায়বদ্ধতা কমে আসায়, গরিবদের মূল্যবান ভোট নেতা-নেত্রীদের কাছে আর বিক্রি করতে হবে না। এরকম অসংখ্য সুবিধা দরিদ্র ভারতবাসীর ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ কিনা, একটি ব্যতিক্রমী সরকার একটি ব্যতিক্রমী যোজনার মাধ্যমে একদিকে যেমন সুনিশ্চিত করতে চলেছেন সর্বসাধারণ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তেমনি অন্যদিকে এদেরকে এনে দিচ্ছেন প্রকৃত রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার স্বাদ।

তা সত্ত্বেও বিরোধীরা কিন্তু কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না এই বলে যে, মোদী এমন কি আর নতুন করলেন! এরকম যোজনা তো যে কোনো সরকারই করতে পারে। একদম ঠিক। কিন্তু তা হলে এতদিন এরকম যোজনা নজরে আসেনি কেন? একটা মজার গল্প দিয়ে লেখাটা শেষ করতে চাই। ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকার ভূখণ্ড আবিষ্কার করার পর তাঁর বন্ধুমহলে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। কলম্বাস এমন কি আবিষ্কার করল যে এত হইচই করতে হবে? আমেরিকা তো ছিলই, কলম্বাস শুধু জাহাজ নিয়ে সেখানে অবতরণ করেছে মাত্র! এই সমালোচনার কীভাবে জবাব দেবেন কলম্বাস ভেবে পাচ্ছিলেন না। একদিন তাঁর মাথায় অদ্ভুত এক বুদ্ধি এল। তিনি তাঁর বন্ধুদের ভোজনসভায় নেমন্তন্ন করলেন। সবাই যখন একত্রিত হলো তখন তিনি বন্ধুদেরকে একটি ডিম দিয়ে সেটিকে খাবার টেবিলের উপর দাঁড় করাতে বললেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, সবাই কত কসরৎ করল, কিন্তু ডিম গড়িয়ে পড়ল! কলম্বাস তখন এসে ডিমটার লম্বাবরাবর একদিকে সামান্য ঠোকা দিয়ে ডিমটাকে সোজা টেবিলে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সবাই রীতিমতো রে রে করে উঠল— এ আবার এমন কি? এতো সবাই জানতো। তাছাড়া তিনি এভাবে যে ডিম দাঁড় করাতে হবে সেটা তো বলেননি। কলম্বাস মুচকি হেসে বললেন 'তোমাদের মতো আমাকেও কেউ কখনো আমেরিকা আবিষ্কার করতে বলেনি।'

কেন্দ্রীয় সরকারের একশো দিন

মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ

অম্লানকুসুম ঘোষ

বর্তমান নবগঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের একশো দিন পূর্ণ হলো। নিজের বর্তমান ও অতীত কর্মের পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নই হলো নিজের ত্রুটি নির্ণয় করে তা সংশোধন করার প্রস্তুতির প্রথম পর্ব। এই সরকারের কর্মক্ষেত্র বহুধা বিস্তৃত। অর্থনীতি থেকে শিক্ষানীতি, বিদেশনীতি থেকে স্বরাষ্ট্রনীতি, বিবিধ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্যায়ন করা সম্ভব ও প্রয়োজন।

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার সবচেয়ে বড় কারণ হলো দুর্নীতি। কালো টাকার কালো ছায়া, টু জি স্পেকট্রাম, কয়লা ও নানা অন্য কেলেঙ্কারির রূপ ধরে গ্রাস করেছিল ভারতীয় অর্থনীতিকে গত একদশকে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই কালো টাকা উদ্ধারে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিদের তত্ত্বাবধানে সিট গঠন করেছে। দ্রুত এবং সদর্থক এই পদক্ষেপ ছাড়াও কালো টাকা উদ্ধারের সিবিআই-কে স্বাধীনভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ফলাফল এখনও লক্ষ্য করা যায়নি কিন্তু ভারতের সমান্তরাল অর্থনীতির জগতে যে একটি আলোড়ন শুরু হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। বিদেশে থাকা কালো টাকা উদ্ধারে সুইজারল্যান্ড ও স্ক্যান্ডিনেভীয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে তথ্যগত সহায়তা চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই নীতি সাফল্যমণ্ডিত হবে কিনা সে কথার উত্তর নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে কিন্তু পদক্ষেপটি যে সদর্থক সে কথা বলাই বাহুল্য।

বৈদেশিক সম্পর্কযুক্ত অর্থনীতির আলোচনায় ঢুকতে হলে বাণিজ্যিক জগতের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থা World Trade Organization বা WTO-র কথা আসবেই। সম্প্রতি WTO-র সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তিরত স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছে ভারত। অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গৃহীত এই পদক্ষেপ প্রশংসিত হয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারাও। একশো ষাটটি দেশের মিলিত এই চুক্তি ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র ভারতের আপত্তিতেই। সিদ্ধান্ত হিসেবে যথেষ্ট সাহসী হলেও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে একথা বলা যায় যে সকলের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে চলা ভারত সরকারের উচিত খাদ্য বণ্টনকে সরাসরি অর্থের ভতুরকিতে রূপান্তরিত করা। এর ফলে লাভ হবে ত্রিবিধ। প্রথমত, এর ফলে খাদ্য সংগ্রহ, মজুত ও বণ্টনজনিত খরচ বাঁচবে ও তজ্জনিত কারণে খাদ্যশস্য নষ্ট ও বন্ধ হবে। দ্বিতীয়ত, মজুত ও বণ্টনের সময়ের দুর্নীতি দূর হবে। তৃতীয়ত, এক বিপুল পরিমাণ কর্মীবাহিনীকে সরকার অন্য কাজে লাগাতে পারবে। সর্বোপরি এর ফলে সরকার মজুতের ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত WTO-র মাপকাঠি থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেই WTO-তে স্বাক্ষর করতে পারবে। সরকার জানুয়ারির মধ্যে সব পরিবারের জন্য অ্যাকাউন্ট খোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। তাই সরকারের উচিত ডিসেম্বরে WTO-র চুক্তিতে স্বাক্ষর করা, কারণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিরূপ শৃঙ্খলমুক্ত অবধি বহুপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারতের শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের সামনে রপ্তানির এক বিপুল সম্ভাবনা দেখা যাবে। ফলে বিদেশি মুদ্রার আগমন ও সঞ্চয় বাড়বে, বাণিজ্য ঘাটতি কমবে ও ভারতীয় মুদ্রা টাকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন ঘটবে। অর্থাৎ একথা বলা চলে যে WTO-তে স্বাক্ষর করতে দেরি করাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দরকষাকষির একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেও চরম অবস্থান না নিয়ে শেষ অবধি স্বাক্ষর করাই বাঞ্ছনীয় অবশ্যই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে।

বহুপাক্ষিক বাণিজ্যে অগ্রগতির নতুন রাস্তা অনুসন্ধানের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রটিকেও তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত এবং সেই গুরুত্ব প্রদানে এখনও অবধি কেন্দ্রীয় সরকার পরাঙ্মুখ নন। উদাহরণ চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর জন্য সচেষ্ট হওয়া। চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি বর্তমানে প্রায় ৩৫০০ কোটি ডলার যা ভারতের মোট বাণিজ্য ঘাটতির প্রায় ৪১ শতাংশ। অর্থাৎ চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-সম্পর্কে একটা ভারসাম্য আনতে পারলে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি (Current A/C deficit) প্রায় অর্ধেক দূর হয়ে যাবে। এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি ক্ষমতায় এসেই করতে উদ্যোগী হয়েছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য তারা ধন্যবাদার্হ।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দ্বারা অর্থনীতির উন্নতি প্রচেষ্টার আরও কিছু নমুনা বর্তমান। যথা প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলি যথা নেপাল ভুটান ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির মাধ্যমে অর্থনীতিকে অক্সিজেনের জোগান বাড়ানোর চেষ্টা করা। এই সব দেশগুলি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও প্রযুক্তিবিদ্যায় পশ্চাৎপদ্। ভারত আপন প্রযুক্তিবিদ্যাকে ব্যবহার করে এই দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পাদককে কাজে লাগিয়ে নিজের অর্থনীতিকে করতে পারে সমৃদ্ধতর। এই বর্ধিত সমৃদ্ধির অংশভোগী হয়ে এই ক্ষুদ্র দেশগুলিও নিজেদের ভাববে উপকৃত। কাজেই এ ব্যাপারে বর্তমান সরকার সঠিক পথের অভিসারী এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না।

প্রযুক্তিবিদ্যায় নেপাল-ভুটানের মতো দেশের তুলনায় অগ্রসর হলেও জাপানের মতো উন্নততর দেশের তুলনায় ভারত এখনও পিছিয়ে। সেই ঘাটতি মেটানোর ব্যাপারেও সক্রিয় হয়েছেন বর্তমান

সরকার। প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরে শুধুমাত্র ৩৫০০ কোটি ডলারের পাহাড়প্রমাণ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিই আসেনি, সঙ্গে এসেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের অবিশ্বাসও। জাপান ও ভারতের সম্পর্ক বহু প্রাচীন। বৌদ্ধ ধর্ম ও জীবনদর্শনের মাধ্যমে জাপান ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল বারোশো বছর আগেই। সাম্প্রতিক অতীতে নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ এবং রাসবিহারী বসুকে সাহায্য করে ভারতের মিত্র হিসেবে নিজের কর্তব্য পালন করেছিল জাপন। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে স্বাধীনতার পর গত চৌষট্টি বছরে ভারত কখনও নবোদিত জাপানের বন্ধুত্বের অভিলাষী হয়নি। প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের জন্য বেশিরভাগ সময় রাশিয়া ও কখনও আমেরিকার মুখাপেক্ষী হায় ভারত আংশিক বিনিয়োগ ও বাতিল প্রযুক্তি পেয়ে এসেছিল এতদিন। এবারে জাপানের সাহায্য প্রত্যাশী হয়ে এতদিনকার ভুলকে খণ্ডন করলো ভারত সরকার। আশা করা যায় ভাবীকাল-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেই।

দেশের অর্থনীতির সার্বিক উন্নতি করতে গেলে শুধুমাত্র বহির্দেশীয় সংস্কার করলেই হয় না সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সংস্কারও দরকার। বর্তমান সরকার সে ব্যাপারেও যত্নশীল। যোজনা কমিশনের বিলোপ এ জাতীয় সংস্কারের একটি নিদর্শন। জহরলালের অদূরদর্শিতার কারণে যোজনা কমিশন জাতীয় অর্থনীতিতে কোনো সদর্থক ভূমিকা নিতে পারেনি কোনোদিনই। বরং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে বিষিয়ে দিয়েছে বারংবার। তবুও সেই যোজনা কমিশনকে বিদায় দিতে পারেনি অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রীই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদার্হ একারণেই যে তিনি কর্তার ভূতের মতো জাতীয় অর্থনীতির স্কন্ধারূঢ় এই যোজনা কমিশনকে বিদায় দিয়েছেন অভূতপূর্ব দ্রুততায়। যোজনা কমিশনের পরিবর্তে নতুন যে কমিশন স্থাপিত হতে চলেছে তার অবয়ব এখনও পরিস্ফুট নয়। অর্থনৈতিক নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণে বলা যায় সেই কমিশন এমন হওয়া উচিত যাতে শুধুমাত্র অর্থনীতিবিদদের আলোচনাস্থল না হয়ে প্রযুক্তিবিদ, বৈজ্ঞানিক, অন্যান্য বিষয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক ও সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত নানা ব্যক্তির উদ্ভাবনী মতামতের বিনিময়স্থল হয়ে ওঠে সেই অনাগত কমিশন। তাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনে কত অর্থ বিনিয়োগ দরকার ও তার দ্বারা অর্থনীতির স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কতটা উপকার হওয়া সম্ভব তার একটা পরিষ্কার চিত্র সরকার ও দেশবাসীর সামনে প্রকট হয়।

যোজনা কমিশনের বিলুপ্তির পর কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক যথেষ্ট উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সে ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ায় ভবিষ্যতে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের অর্থনীতির বিজয়রথ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান থাকবে এই আশা করা যায়।

ভারতীয় অর্থনীতির আর একটি সাম্প্রতিক বড় ব্যাধি হলো অনাদায়ী ঋণের সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্যা দূরীকরণেও বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, কিংফিশার এয়ার লাইন্সের বিজয় মাল্য সহ বেশ কিছু অনাদায়ী ঋণগ্রহীতা কোম্পানির ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে সরকার। আশা করা যায় এর ফলে অর্থনীতির মেরুদণ্ডস্বরূপ ব্যাঙ্কগুলির ওপর থেকে অনাদায়ী ঋণ প্রবেশন করার বিপুল বোঝা নেমে যাবে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক নিজের লভ্যাংশ বাড়াতে পারবে যার সুফল পাবে দেশের সামাজিক অর্থনীতি।

সম্পূর্ণ নিখুঁত এ জগতে কেউ হতে পারে না। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের এই আপাতসফল পদক্ষেপগুলির পাশাপাশি কিছু আপাতব্যর্থ পদক্ষেপও আছে। যেমন রেল ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়া। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের দেশ পশ্চাৎপদ সেখানে বিদেশি প্রযুক্তিবিদদের মেধা ও জ্ঞানের সাহায্য অবশ্যই নেওয়া উচিত। কিন্তু বিদেশী বিনিয়োগ-কারীদের রেল ও প্রতিরক্ষার মত সম্পূর্ণ সরকারি ক্ষেত্রে স্বাগত জানালে আধিক লাভের উদ্দেশ্যে তারা পরিকাঠামোর দীর্ঘমেয়াদি উন্নতিতে নজর দেবে না, ক্ষতি হবে দেশবাসীর। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে তো বিদেশে তথ্য পাচারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিনিয়োগের জন্য অর্থ প্রয়োজন হলে দেশবাসীর থেকে নতুন নতুন সরকারি বন্ডের মাধ্যমে তা তোলা উচিত। বর্তমানে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত পাঁচ কোটি কোটি টাকার কাছাকাছি। যা দেশবাসীর সঞ্চয়, এর এক সামান্য অংশ সরকারি বন্ডের মাধ্যমে তুলে নিলেই বিনিয়োগের জন্য অর্থের অভাব হবে না, মুনাফালোভী বিদেশী বিনিয়োগকারীদের খাল কেটে ডেকে আনার দরকারও হবে না।

দুটি বড় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রথমত, যাদের পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদ আছে তাদের ওপর সম্পদকর এক শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পাঁচ শতাংশ করা উচিত। বর্তমানে ভারতে এরকম ধনী ব্যক্তির সংখ্যা একশো তেতাল্লিশ এবং তাদের মিলিত সম্পদের পরিমাণ চোদ্দ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি, কাজেই তাদের ওপর বর্ধিত সম্পদকর জনিত সরকারের বর্ধিত আয় দাঁড়াবে বছরে সত্তর হাজার কোটি টাকা। দ্বিতীয়ত, যাদের আয় বার্ষিক দশ কোটি টাকার বেশি তাদের ওপর আয়কর তিরিশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে চল্লিশ শতাংশ করা উচিত, এতেও সরকারের বার্ষিক আয় প্রায় তিরাশি হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। পূর্ববর্তী সরকার করের ওপর সেস বসানোর মতো পরোক্ষ ব্যবস্থা নিয়েছিল যা তেমন কার্যকরি হয়নি। বর্তমান সরকার প্রত্যক্ষভাবে কর বাড়ালে লাভবান হোত।

উপরোক্ত দুটি ক্ষেত্রে সরকার উপরিউল্লিখিত পদক্ষেপদ্বয় গ্রহণ করলে সরকারের আয় বাড়তো মিলিতভাবে এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা। ফলে সরকারি আয়-ব্যয় ঘাটতির (Fiscal deficit) দুশ্চিন্তা দূর হোত, সরকার আরও বেশি করে পরিকল্পনা ক্ষেত্র আয় করতে পারতো। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি সরকার এই দুটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সাফল্যের তুঙ্গস্পর্শী পর্বতশীর্ষ ও ব্যর্থতার অতলস্পর্শী গহ্বর এই দুইয়ের মিলনেই জীবন গঠিত হয়। সাফল্য ও ব্যর্থতার মিলিত কোলাজেই গঠিত তা। কিন্তু সাফল্য বা ব্যর্থতা যাই আসুক যে অদম্য প্রচেষ্টা সরকার দেখিয়েছে, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে ক্ষমতা সরকার দেখিয়েছে তা দেশবাসীর চোখে আশার আলো এনে দিয়েছে একথা বলা যায়।

পরিবেশ ও কলকাতার পুকুর

মোহিত রায়

পুকুর মানে কত কিছু

পুকুরে জল-তো থাকবেই। এই রুক্ষ কঠোর শহরের মাঝে এইসব পুকুরেরা শুধু জল নয় আরো অনেক কিছু আগলে রেখেছে। আমাদের দেশের শহরগুলির রোজকার জলের চাহিদার অনেকটাই মেটায় এই পুকুরগুলি। শহরের মানুষ এতে স্নান করেন, কাপড় ধোন, বাসন মাজেন আরও অনেক কাজ করেন। এঁদের অনেকেই গরিব মানুষ বা শহরে কাজ করতে আসা শ্রমিক যাঁদের এই পুকুর ছাড়া কোনো গতি নেই। কলের জলের নাগরিক সুবিধা এঁরা কোনোদিনই পান না। শহরের অনেক মানুষের সংসার চলে এইসব পুকুরে মাছ ধরে বা বিক্রি করে। পুকুরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বৃষ্টির জল ধরে রাখা। শহরের পুকুরগুলি তাই বৃষ্টির জলের ভাঁড়ার। এই জল পুষ্ট করে ভূগর্ভের জলের স্তর। ঘিঞ্জি শহরের অনেক জায়গাতে এইসব পুকুরের ধারই একটু খোলা জায়গা যেখানে কিছুটা মুক্ত বাতাস বয়। এই খোলা জায়গাতেই বড় হয় কিছু গাছপালা, এখানেই কিছু পাখি বাসা বাঁধে, কাঠবিড়ালি দৌড়দৌড়ি করে। জলের মাছ, স্থলের কাঠবিড়ালি আর আকাশের পাখি নিয়ে এরাই শহরের জীবজগৎ তৈরি করে। এই একটু খোলা পুকুর পাড়ের বেঞ্চিতে বসে সকাল সন্ধের আড্ডা, কখনো পাশে ক্লাবঘর, কোথাও মন্দির। কোথাও এই পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন হয়, মন্দিরের পাশের মাঠে বসে চড়ক বা শ্রাবণের মেলা। শহরের নাগরিক সাংস্কৃতিক জগতের অংশ হয়ে ওঠে পুকুরেরা। শহর আর পুকুরের এই আন্তঃসম্পর্কে জড়িয়ে যায় শহরের পরিবেশ, অর্থনীতি আর সমাজ। নীচে সেই আন্তঃসম্পর্কের **সারণি দ্রষ্টব্য**।

এটা কলকাতাবাসীর জানা দরকার যে কলকাতার প্রায় ৫ হাজার পুকুরের সরাসরি ব্যবহারকারীরা মূলত গরিব মানুষ। এই গরিব মানুষদের বাড়িতে জলের যোগান নেই, ফলে পুকুরে স্নান ও কাপড় কাচা তাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় সব পুকুর বুজিয়ে ফেলার জন্য সেখানে গরিব মানুষদের লজ্জাজনকভাবে (বিশেষত মহিলাদের) জনসমক্ষে প্রায়শই ঝগড়াঝাটি করে রাস্তার কলের জলে স্নান করতে হয়। দেড় দশক ধরে কলকাতা শহরের পুকুর বাঁচানোর আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ করার অভিজ্ঞতায় এটা মনে হয়েছে যে, পুকুরের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 'ভদ্রলোকেরা'

সারণি

শহরে পুকুরের ভূমিকা

পরিবেশের বিষয়	ভূমিকা	বিবরণ
জল সম্পদ	স্নান	শহরের অনেক মানুষ স্নান করেন যাঁদের অনেকেই গরিব মানুষ এবং এই পুকুর ছাড়া কোনো গতি নেই।
	ধোওয়া	শহরের অনেক মানুষ কাপড় ধোন, বাসন মাজেন আরও অনেক কাজ করেন।
	বৃষ্টির জল সংরক্ষণ	বৃষ্টির জল ধরে রাখে।
	ভূগর্ভের জলস্তর	ভূগর্ভের জলস্তর পুষ্ট করে।
পরিবেশ	স্থানীয় আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ	পুকুর স্থানীয় আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে ও ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ রাখে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
	খোলা জায়গা	পুকুরের ধারই একটু খোলা জায়গা যেখানে কিছুটা মুক্ত বাতাস বয় ও সেজন্য অবসর বিনোদনের স্থান।
	গাছপালা	শহরের সবুজকে অনেকটা বাঁচিয়ে রাখে পুকুর পাড়ের গাছপালা ও বাগান।
	প্রতিবেশ	জলের মাছ, স্থলের গাছপালা ছোট পশু আর গাছের পাখি নিয়ে শহরের জীবজগৎকে সমৃদ্ধ করে।
অর্থনীতি	মাছের চাষ	অনেক মানুষের জীবিকার সংস্থান করে।

একেবারেই আমল দেন না। ফলে শহরের পুকুর বাঁচানোর আন্দোলনে অনেক সময়ই জড়িত আছেন অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত মানুষেরা যারা নিজেদের পাড়ার বা হাউসিং কমপ্লেক্সের পরিবেশ উন্নয়নের কথার বাইরে আর কিছু ভাবেন না। তাঁরা এটিকে আলো দিয়ে সাজিয়ে সৌন্দর্যায়নে ব্যস্ত থাকেন, সামাজিক পুকুরকে ব্যক্তিগত কয়েকজনের উন্নত জীবনযাত্রার জন্য ব্যবহারের বন্দোবস্ত করেন পরিবেশ উন্নয়নের দোহাই দিয়ে। এমনকী এই উন্নয়নের টাকাটাও তাঁরা কখনোই নিজেরা দিতে চান না, সেটার জন্য তদ্বির করে পুরসভার টাকার ব্যবস্থা করেন। বিকল্প জলের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত উন্নয়নের নামে পুকুরের সামাজিক ব্যবহারে সাধারণ মানুষের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা অনুচিত।

এত কিছু কাজ ওই ছোট্ট পুকুরের!

পুকুর নিয়ে আইন

স্বাধীনতার আগে থেকেই পুষ্করিণী সংরক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি আইন জারি হয়। কলকাতা পুরসভা আইন ১৯৮০ বিভিন্ন ধারায় পুষ্করিণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ধারা ৩০৯ পুকুরের ১৫ মিটারের মধ্যে বাড়ির পয়ঃপ্রণালী, মূত্রাগার বা অনুরূপ কোনো নোংরা নালার নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছে। জলের ধারার পাশে কোনো কঠিন বর্জ্য ফেলা নিষিদ্ধ করেছে ৩৩৬ ধারা। ধারা ৪৯৬ অনুযায়ী কোনো পুকুর জনস্বাস্থ্যের হানি ঘটালে এটি বুজিয়ে ফেলাসহ এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার নির্দেশ দিয়েছে। মশার আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠা আটকাতে বদ্ধ জল জমা রাখার বিরুদ্ধেও নির্দেশ দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ পুরসভা আইন ১৯৯৩-এর ৩৪০ ধারাতে কোনো সরকারি বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুরকে পানীয় জলের উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা হলে সেখানে অন্য কোনো কাজ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। একইভাবে কোনো পুকুর স্নানের জন্য নির্দিষ্ট হলে সেখানে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, পশুর স্নান করানো নিষিদ্ধ।

অন্যদিকে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিজ অ্যাক্ট, ১৯৮৪ (নদী ও পুকুর মৎস্যচাষের আইন)'-এর উদ্দেশ্য মৎস্যচাষের সম্প্রসারণ, কিন্তু তা প্রমোটারদের হাত থেকে পুকুরকে বাঁচাতে বহু ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। এই আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী কোনো পুকুর যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে বা যথাযথভাবে মৎস্যচাষ না হলে মৎস্যদপ্তর তার পরিচালনাভার অধিগ্রহণ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে পুষ্করিণী সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে কার্যকর আইনটি হলো 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯৩' (নদী ও পুকুরে মৎস্যচাষের সংশোধিত আইন)। সংশোধিত আইনে যে কোনো পুষ্করিণীকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার (যথা বুজিয়ে গৃহনির্মাণ) নিষিদ্ধ করে নতুন একটি পরিচ্ছদ ৩-এ সংযোজিত হয়েছে। এই আইনের ১৭-এ ধারা অনুযায়ী।

- পুকুর বা জলা জায়গা বলা হবে যদি তা 'প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট উপায়ে নিচু জমি বা আয়তনে ৫ কাঠা বা ০.০৩৫ হেক্টরের বেশি, যেখানে বছরে অন্ততপক্ষে ছ' মাস জল থাকে'।
- যে কোনো পুকুর বা জলা জায়গাকে বুজিয়ে ফেলা বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না যাতে তা মৎস্যচাষের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।
- মৎস্যচাষ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো পুকুর বা জলা জায়গাকে বিভাজন করে ৫ কাঠা বা ০.০৩৫ হেক্টরের কম করা যাবে না বা অন্য কোনো ব্যক্তির নামে হস্তান্তর করা যাবে না।
- আইন লঙ্ঘিত হলে সংশ্লিষ্ট পুকুরের পরিচালনভার মৎস্যদপ্তর অধিগ্রহণ করতে পারে।
- বুজিয়ে ফেলা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে দায়ী ব্যক্তিকেই পুকুরটিকে আবার আগের চেহারায় ফিরিয়ে দিতে হবে।
- এই আইনের ধারাগুলি লঙ্ঘন একটি আদালতগ্রাহ্য অপরাধ এবং অভিযুক্তকে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

জল (দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ) আইন ১৯৭৪ একটি কেন্দ্রীয় আইন। ধারা ২৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-নির্ধারিত মান না হলে জলে কোনো বর্জ্য ফেলা যাবে না। ধারা ৪১ অনুযায়ী দোষী ব্যক্তির ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

(লেখক অধ্যাপক ও পরিবেশবিদ)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অধ্যায়

এন. সি. দে

'প্রাচীন ভারতে আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন চিন্তা' একটি গ্রন্থ ঠিকই, কিন্তু তা আচার্য রায়ের লেখা গ্রন্থ নয়। এটি প্রফুল্ল চন্দ্রের ভারতে আয়ুর্বেদ ও রসায়ন চিন্তা সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা ও ভাষণের সঙ্কলন। সঙ্কলক সলিল সাহা ও অসীম চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও যত্নের সঙ্গে এমন একটি শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন। তাঁরা প্রথমেই রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার জটিল তত্ত্ববিষয়ক লেখা ও ভাষণগুলি না দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়েছেন। এমন লেখা ও ভাষণগুলি প্রথম দিকে উপস্থাপন করেছেন যা পাঠকের ধৈর্যচুতি তো ঘটাবেই না বরং পাঠকের মনে তার দেশের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে শ্রদ্ধা গড়ে তুলবে। সঙ্কলকও চেষ্টা করেছেন যাতে পাঠকের মনে প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চা সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠুক প্রথম কয়েকটি লেখায়। তাই তাঁরা প্রথমে 'প্রাচীন ভারতে রসায়ন', 'হিন্দু রসায়নের প্রাচীনত্ব'; 'প্রাচীন যুগের হিন্দুদের রসায়ন বিষয়ক জ্ঞান'; 'চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ', 'আয়ুর্বেদের প্রাচীনত্ব', 'রসায়ন শাস্ত্র : নব্য ও প্রাচীন' এবং 'বিজ্ঞানচর্চা প্রাচীন ও নব্য ভারতে : একনিষ্ঠ সাধনা'— এইভাবে পরপর ধাপে ধাপে তাঁদের প্রথম অধ্যায়টিকে সাজিয়েছেন : দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে সাজিয়েছেন আচার্যের বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি'র বিষয় নিয়ে; যদিও তা পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ নয়, বাংলায় সংক্ষিপ্তসার।

প্রথম লেখাটি 'এসেজ অ্যান্ড ডিসকোর্সেস' থেকে গৃহীত। লেখাটি ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কর্তৃক প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতার পূর্ণাঙ্গ বয়ান। এই বক্তৃতার শুরুতেই তিনি বলেছেন, ''ভারতীয়দের বৌদ্ধিক বিকাশের ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়কে আপনাদের সামনে উন্মোচিত করার চেষ্টা

করব আমি। বিস্মৃত অধ্যায়টি হলো পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের চর্চা। সাধারণত এটা ধরেই নেওয়া হয় যে হিন্দুরা ছিল স্বপ্নদর্শী, রহস্যবাদী মানুষ। অধিবিদ্যক অনুমান আর আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনাতেই নিমগ্ন থাকত তারা। ...কিন্তু পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে হিন্দুদের যে প্রভূত অবদান আছে, সে কথা আজ আর প্রায় কেউই মনে রাখেননি।''

প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে রসায়ন সংক্রান্ত জ্ঞানের অগ্রগতি বরাবরই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রকে আকৃষ্ট করত। এমনকী তিনি যখন ছাত্র হিসেবে বিদেশে ছিলেন, তখনও তিনি এই রসায়ন শাস্ত্রে ভারতের অবস্থান নিয়েই অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। তিনি নানান তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে 'খৃস্টের জন্মের বেশ কয়েকশো বছর আগেই ভারতে আয়ুর্বেদের চর্চা ছিল।' এই আয়ুর্বেদ চর্চা সম্পর্কে তিনি নানা তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই চর্চার সঙ্গে পতঞ্জলির যোগদর্শন ঘটেছিল সংযোগ যার ফলে ভারতীয় রসায়ন চর্চা হয়ে উঠেছিল মুক্তিলাভের অন্যতম একটি উপায়। একথা মুসলমান পর্যটক আলবিরুনির লেখাতেও আমরা দেখি। লেখক যদিও খেদ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে 'পরবর্তীকালে যোগদর্শন বিজ্ঞানচর্চার সহায়ক ভূমিকা থেকে বিকৃত হয়ে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, বিশেষত বাংলায়।' প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রফুল্লচন্দ্র

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন।

— ব্যবস্থাপক

তাই আহ্বান জানিয়েছেন : ''জ্ঞানের শিক্ষার্থীরা শোন, আমাদের দেশের গভীরতম বিজ্ঞান এতই প্রাচীন এবং এতই বিশিষ্ট যে যোগ্যতম লেখকরা পর্যন্ত এমনকী পিথাগোরাসীয় সম্প্রদায়ও তাদের চিন্তার সূত্র আহরণ করেছিল আমাদের দেশের প্রাচীন দর্শন থেকে।''

'হিন্দু রসায়নের প্রাচীনত্ব' সম্পর্কে তাঁর ধারণা এতটাই দৃঢ় ছিল যে তিনি বিশিষ্ট প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের পর্যন্ত কটাক্ষ করে বলেছেন, 'রসায়ন আর গণিত হিন্দুরা আরবদের থেকে কিছু শেখেনি, বরং তারাই আরবদের শিখিয়েছে। এই ক্ষেত্রে হিন্দুরাই ছিল অগ্রদূত। ধাতুবিদ্যা অর্থাৎ খনিজ আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে অনেকদিন আগেই হিন্দুরা যথেষ্ট অগ্রগতি করেছিল।'' দিল্লীর সন্নিকটে কুতুব মিনারের কাছে প্রায় ১৫০০ বছর আগে নির্মিত পেটা লোহার স্তম্ভ, পুরীতে লোহার তৈরি বিশাল কড়ি, সোমনাথের অলঙ্কৃত তোরণসমূহ এবং নারওয়ারের ২৪ ফুট লম্বা পেটা লোহার কামান এগুলির প্রতিটাই অতীত দিনের শিল্পকর্মের স্মৃতিচিহ্ন এবং ধাতুবিদ্যার ক্ষেত্রে হিন্দুরা যে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেছিল তার নীরব অথচ চমৎকার সাক্ষ্য বহন করছে এগুলো।

এরকম নানান উদাহরণ ও তথ্য দিয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বলেছেন, ''যে মহান জাতির অংশীদার হিসেবে আমি গর্ববোধ করি, তাকে আমার কিছু দেওয়ার আছে বলে মনে করেছিলাম আমি। ...কতটা সফল হতে পেরেছি সেটা বলার দায়িত্ব আমার নয়। ...আমি আপনাদের রসায়নের চর্চা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি নিজেদের কাজের সাহায্যে আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন যে জ্ঞানের জগতে আপনাদের গৌরবময় পূর্বপুরুষদের সার্থক উত্তরাধিকারী আপনারা।'' তাঁর মতে, ''বাল্মীকি ও ব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি, শঙ্করাচার্য ও রামানুজ, নাগার্জুন ও যশোধর, বরাহমিহির ও ভাস্করাচার্য এবং শেষত রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের জন্মভূমি হিসেবে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যে আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশকেই বেছে নিয়েছেন, তা মোটেই অকারণে নয়। তাই দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর আহ্বান— ''আমি বিশ্বাস করি তোমরা, উদীয়মান প্রজন্মের তরুণরা, তোমাদের ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হবে না। অতীতের গৌরবময় সমৃদ্ধির দিনগুলির মতোই ভবিষ্যতেও আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি মাথা উঁচু করে রাখতে পারবে কিনা এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিজেদের জন্য একটা স্বীকৃত স্থান সুনিশ্চিত রাখতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করছে তোমাদের উপরই।''

আজ আমাদের দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও নেতা-মন্ত্রীগণ যখন কথায় কথায় ভারতীয় তথা হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞানের গৌরবময় অতীতকে লাঞ্ছিত করছে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়গান করছে সেই সময়ে এই গ্রন্থের প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমার ধারণা। কেন্দ্রের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীও ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও গৌরবময় জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে সমান শ্রদ্ধাশীল হওয়ায়, এই সরকারের কাছে আবেদন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী ও তার চিন্তাধারাগুলি সরকারি গ্রন্থন বিভাগের মাধ্যমে (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট) স্বল্পমূল্যে ব্যাপক প্রকাশনা ও প্রচারের ব্যবস্থা করুক বিভিন্ন ভাষায়। বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষাস্তর পর্যন্ত সিলেবাসে প্রফুল্ল চন্দ্রের বই ও চিন্তাধারা অন্তর্ভুক্ত করুক। বইটির প্রকাশক ও সম্পাদকদ্বয়কে ধন্যবাদ এবং অনুরোধ বইটি যদি অন্যান্য ভাষায় ছাপানো যায়। বইটির প্রচ্ছদ ও ছাপা ঝকঝকে এবং নির্ভুল। বইটির মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এর পাতা, যা সংরক্ষণ উপযোগী।

প্রাচীন ভারতে আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন বিদ্যা
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।
সম্পাদনা : সলিল সাহা ও
অসীম চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক : দীপায়ন। ২০, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯। মূল্য : ৩০০ টাকা।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER
OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

সংস্কৃতভারতীর শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

''সংস্কৃতের মাধ্যমেই নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন রোধ করা সম্ভব। কিছুদিন আগে টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়ায় এক সংবাদ বের হয়েছিল। আমেরিকার ধনবান পুত্র মাকে নিঃস্ব করে বাড়ি বিক্রি করে বিমানবন্দরেই ফেলে রেখে চলে যায়। মা'র স্থান বর্তমানে সরকারি বৃদ্ধাশ্রমে। এদেশের উদাত্ত সংস্কৃতি ও চরিত্রের উদাহরণ এবং উপদেশ সংস্কৃত শ্লোকে রয়েছে। সংস্কৃতকে (ভাষা) পরিত্যাগ করার জন্যই নানারকম অনৈতিক ঘটনা ঘটছে।'' —কথাগুলি বলেন গত ৩০ আগস্ট হালিশহরে শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সারস্বত মঠে সংস্কৃতভারতীর দশদিবসীয় সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সংস্কৃত ভারতীর অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ড. নন্দকুমার। হালিশহরস্থিত স্বামী নিগমানন্দ মঠে এই আবাসিক প্রশিক্ষণবর্গে পশ্চিমবঙ্গে ১০২ জন শিক্ষার্থী (শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী) যোগ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ৩৩ জনই ছাত্রী এবং শিক্ষিকা। নন্দকুমার সংস্কৃতকে ভারতে কথ্যভাষা হিসেবে প্রচলিত করার জন্য সরল সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভগীরথ প্রয়াস সংগঠনের পক্ষ থেকে চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি অধ্যাপক খড়্গপুর আই আই টি-র ড. দেশাই সংস্কৃতকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৈজ্ঞানিক ভাষা বলে উল্লেখ করে উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করেন। বিশিষ্ট অতিথি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. প্রদীপ মজুমদার বলেন, সংস্কৃত ভাষাতেই প্রাচীন ভারতে গণিত (পাটীগণিত ও বীজগণিত) রচিত হয়েছিল।

শ্রীশ্রী অসম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের মহন্ত মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দজী আশীর্বচনে বলেন, ''সংস্কৃত ভাষা অমৃতস্বরূপা। শিশুও সংস্কৃত বলতে পারে। সংস্কৃত ভারতী খুবই মহৎ কাজ করছে।'' সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরে রাজ্যের ১৫টি জেলার প্রতিনিধিত্ব ছিল। শিবির পরিচালনায় স্বামী নিগমানন্দ মঠের অকৃপণ সহযোগিতা ছিল। সংস্কৃতভারতীর সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ শ্রীশ দেওপূজারী শিবির পরিদর্শন করেন। কেরল থেকে আগত রণজিত কুমার পুরো সময় বর্গে থেকে প্রশিক্ষণ দেন। সব থেকে আকর্ষণীয় ছিল ২৯ আগস্ট হালিশহরে শিবিরার্থীদের সুন্দর শোভাযাত্রা। শহরের বাগমোড়-এ সংস্কৃত পথনাটিকাও পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের শুভারম্ভ

সারা দেশের সঙ্গে আজ সমস্ত উত্তরবঙ্গের ৫০ প্রখণ্ড স্থানে বিশ্বহিন্দু পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস তথা শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব ধুমধাম এবং উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। মুখ্য কার্যক্রমে সর্বত্র স্বর্ণ জয়ন্তীর ব্যানার সহ সুসজ্জিত ধর্মীয় শোভাযাত্রা হয়। সর্বনিম্ন ১ হাজার থেকে ১০/১২ হাজার লোকের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত ভাবে হিন্দু সমাজ বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে নিজের সংগঠন হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হিসাবে ভাবা যায়। কোথাও শুরুতে, কোথাও শোভাযাত্রার শেষে বক্তব্যের মাধ্যমে স্বর্ণজয়ন্তী বর্ষ তথা শ্রীকৃষ্ণের কর্মধারা সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়। মাথায় গেরুয়া ফেট্টি— সুদর্শন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের ট্যাবলো এবং বিভিন্ন ধ্বনি মানুষের বুকে সাহস জুগিয়েছে। এছাড়া পূজা পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় অধিকারী বসন্তরথ আলিপুর দুয়ার জেলায় হাতিপোতা, পলাশবাড়ি; প্রান্ত সম্পাদক উদয়শঙ্কর সরকার কোচবিহার; সভাপতি শ্রীওমজী শিলিগুড়ি; প্রান্তসংগঠন সম্পাদক গৌতম কুমার সরকার শিলিগুড়ি ও মালদার চাঁচলে অংশ নেন। প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক জানান, আগামী ২ নভেম্বর সমস্ত জেলায় হুতাত্মা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ৫০০ ইউনিট রক্ত একই দিনে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বজরংদলের পরিচালনায় বিভিন্ন Blood Bank-এর মাধ্যমে সংগৃহীত হবে।

মহিলা সমন্বয় বৈঠক

গত ২৩ আগস্ট ২০১৪ শনিবার বিকেল ৪টেয় কলকাতার কেশবভবনে অনুষ্ঠিত হয় মহিলা সমন্বয় বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় মহিলা সমন্বয় সংযোজিকা গীতা গুপ্তে। প্রারম্ভিক বক্তব্যে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রান্তীয় কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী ব্যাখ্যা করেন বাংলায় মহিলা সমন্বয়ের কাজ কীভাবে আরম্ভ হয়েছিল। গীতা গুপ্তে অখিল ভারতীয় স্তরে কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, বিবিধ ক্ষেত্রে মহিলারা কাজ করছেন, কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক পরিচয় বা আদান-প্রদান নেই। এই কারণেই মহিলা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। এছাড়া নারী জীবনের লক্ষ্য, আদর্শ নিরূপণ ও সামগ্রিক ভাবে নারী সমাজের সমস্যা সমাধানের জন্যও মহিলা সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীশক্তি একত্রিত হতে পারে।

সভায় উপস্থিত নাট্যশিল্পী, ছাত্রী, গৃহবধূ, সঙ্গীতশিল্পী, সমাজসেবী, আইনজীবী মহিলারা নারী স্বাধীনতা সম্পর্কীয় নিজের নিজের অভিমত এবং অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সুস্মিতা ঘোষ। মা সারদার নানা উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এবং বাস্তব জীবনের নানা ঘটনা উল্লেখ করে ড. সুস্মিতা ঘোষ বক্তব্য রাখেন।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কল্যাণ আশ্রম, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, বিবেকানন্দ পাঠচক্র, সংস্কার ভারতী, দুর্গাবাহিনী, সমাজ সেবা ভারতী, ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি মহিলা মোর্চা প্রভৃতি সংগঠনের মহিলা সদস্যা-সহ রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির মহুয়া ধর, মায়া মিত্র, ড. দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্য-ব্যক্তিত্ব ভদ্রা বসু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৬৮ জন মহিলার সক্রিয় উপস্থিতি ছিল।

সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়। প্রসঙ্গত শ্রীমতি রায় বিগত দুই বছর বাংলায় মহিলা সমন্বয় সংযোজিকার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জন্মাষ্টমী উৎসব

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্রহ্মপুর জেলার সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষের সূচনা হয় জন্মাষ্টমী উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে। এই উপলক্ষে পরিষদের ব্রহ্মপুর জেলার বেলডাঙ্গা প্রখণ্ডের সারগাছি গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ পূজার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গ্রামের শিশুদের কৃষ্ণ সাজিয়ে এক নগর সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। সমগ্র গ্রাম পরিক্রমান্তে মন্দির প্রাঙ্গণে ধর্মসভা হয়। কৃষ্ণসাজা শিশুদের খাতা-কলম, বই ও শ্রীকৃষ্ণের একটি আলোকচিত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিষদের সদস্য সন্তোষ, মাধব, সাগর, সুদীপ্ত, অরূপ, নব, ধীরেন, প্রভাত প্রমুখ। শেষে ৩০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের বীরভূম জেলা সম্মেলন

গত ২৪ আগস্ট সিউড়িতে অনুষ্ঠিত হলো বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের বীরভূম জেলা সম্মেলন। স্থানীয় চন্দ্রগতি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সারাদিন ব্যাপী সম্মেলন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ৮৬টি বিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, ক্ষেত্র-প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, সাহিত্যিক ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রগতি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. পবিত্র দাসবক্সী প্রমুখ। এছাড়া বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রাদেশিক সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল, সংগঠন সম্পাদক নারায়ণ পাল ও সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ সারাদিনব্যাপী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী মজুমদার সমবেত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন প্রবৃত্তিকে সংস্কারিত করে প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতে হবে।

এদিনের সম্মেলনে নতুন ভাবে বীরভূম জেলা সমিতি গঠন করা হয়। নতুন সমিতিতে বামাচরণ রায়, সভাপতি; প্রহ্লাদ মণ্ডল, সম্পাদক ও সুব্রত সিংহ, কোষাধ্যক্ষ হিসাবে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন।

বেহালায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বিশ্ব বিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পুজো-পাঠ ও তিলক ধারণের মাধ্যমে অত্যন্ত সুচারুরূপে পালিত হয়। বিকাল চারটায় বেহালার পাঠকপাড়ার সন্তোষীমাতার মন্দির থেকে বেহালা চৌরাস্তার জনকল্যাণ বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত ভারতমাতা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের তিনটি বৃহৎ ট্যাবলো-সহ বিশাল বর্ণাঢ্য এক ঘণ্টার শোভাযাত্রা হয়। প্রায় শতাধিক গাড়ি-বাইক ইত্যাদি সুসজ্জিত এবং সারিবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করে। এরপর মঙ্গলাচারণ ও গীতা পাঠের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম সম্মেলন শুরু হয়। অনুষ্ঠানে ভজন, নামগান-সহ ভক্তিমূলক সঙ্গীত আলেখ্য পরিবেশিত হয়। কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা খুব উপভোগ্য হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভের ইচ্ছায় সহস্রাধিক ভক্ত এই পবিত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

কিষাণ দিবস পালন

গত ৩১ আগস্ট 'ভাদ্র শুক্ল ষষ্ঠী তিথি' কৃষিদেবতা ভগবান শ্রীবলরামের জন্মদিনকে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘে 'কিষাণ দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। সারা পশ্চিমবঙ্গে শতাধিক স্থানে বলরাম পূজার মাধ্যমে কিষাণ দিবস পালিত হয়। উল্লেখ্য, বলরাম পূজার মাধ্যমে শিলিগুড়ি হাকিম পাড়ায় ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কার্যালয় উদ্বোধন হয়। শ্রীবলরাম-এর মূর্তি-সহ পূজা মুর্শিদাবাদ জেলার কল্যাণপুর গ্রামে দুই শতাধিক কৃষকের উপস্থিতিতে প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ কুমার মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। বর্ধমান জেলার ধরমপুর- কালিকাতলা একচাকা গ্রামে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি নন্দলাল কাট ও সদস্য প্রভাত কুমার মণ্ডল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় করদহ হঠাৎ পাড়ায় মীরা মহন্তের নেতৃত্বে আনন্দবর্ধক কার্যক্রমে বক্তব্য রাখেন অধীর দাস ও সন্তোষ সরকার। উত্তর দিনাজপুর জেলায় মহেশপুরে বক্তব্য রাখে স্বদেশ ঝা চক্রবর্তী ও ব্যোমকেশ রায়। জলপাইগুড়ি জেলার মোহিতনগরে জেলা সম্পাদক কার্তিক বিশ্বাস আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাণীরাসমণিতে কিষাণ সমাবেশের সূচনা দেন। কোচবিহার জেলার কুর্শামারিতে, রবীন্দ্রপল্লী ও নাগুরুর কাঠে অনুষ্ঠান হয়। দার্জিলিং জেলার কালিংপং-এর ডুংরাবস্তিতে কিষাণ দিবস পালিত হয়।

কল্যাণ ভবনে অখণ্ড ভারত দিবস উদ্‌যাপন

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রধান কার্যালয় কল্যাণ ভবনে অখণ্ড ভারত দিবস উদ্‌যাপন করে কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগর সমিতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতি। এর মধ্যে ছিল মানিকতলা মহিলা সমিতি, শিবপুর পুরুষ ও মহিলা সমিতি, দক্ষিণ কলকাতা মহিলা সমিতি, বিধাননগর পূর্ব পুরুষ ও মহিলা সমিতি। অনুষ্ঠানে দুটি বিভাগে এইসব সমিতির মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড ভারততত্ত্ব-সহ রাষ্ট্রনির্মাণ ভাবনা এবং স্বাধীনোত্তর ভারতে জনজাতি সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক হিসেবে সংগঠনের দুই বরিষ্ঠ কর্মকর্তা অধ্যাপক (অবসর প্রাপ্ত) সত্যগোপাল রায় ও অধ্যাপক গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

শব্দরূপ-৭২৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

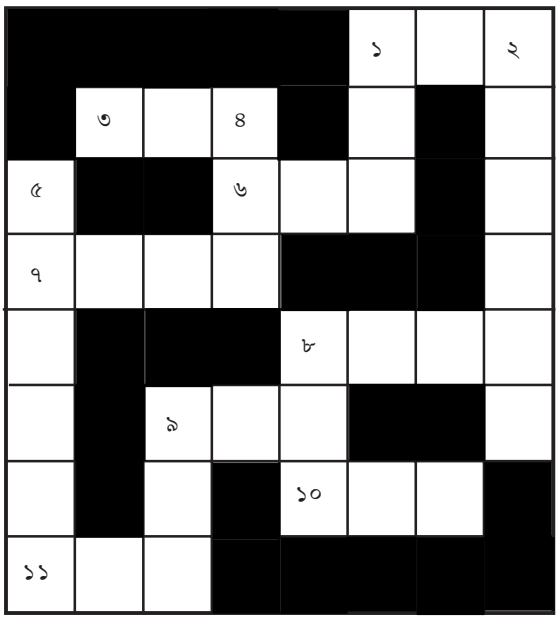

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. সম্প্রতি ভারতবর্ষ থেকে এই রোগটি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে, **৩.** অমানুষী বা দৈবশক্তির প্রভাব, **৬.** রোমন্থন, চর্বিতচর্বণ, **৭.** চিনির লেপযুক্ত সন্দেশ (মিষ্টান্ন বিশেষ), **৮.** হলদে রং বিশেষ (প্রবাদ—গোমস্তক বা গো-পিত্তজাত), পিউড়ি, **৯.** বেগুন; প্রথম দুয়ে সমাচার, **১০.** রাধিকার সখী, **১১.** 'রতনে—চেনে'।

উপর-নীচ : ১. যে নোট টাকা ইত্যাদি ভাঙাইয়া দেয় বা সোনা রূপা যাচাই করে বা কিছু বন্ধক রেখে ধার দেয়, **২.** উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগের পত্র, **৪.** ঠিকা; নির্দিষ্ট খাজনায় জমির বন্দোবস্ত, **৫.** ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী সমুদ্র, **৮.** শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি; মথুরার নিকটস্থ গ্রাম, **৯.** বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার।

সমাধান
শব্দরূপ-৭২০
সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
রামহরি মণ্ডল
ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ
অমর দাস
রবীন্দ্রনগর,
জলপাইগুড়ি

ব্য	ব	স্থা	■	হি	ন্দু	স্থা	ন
ক্ত	■	ব	র	ং	■	■	■
■	অ	র	■	সা	ন্দী	প	নি
■	হি	■	■	■	■	ত	■
■	ং	■	■	■	■	ঞ্জ	■
হাঁ	স	ফা	স	■	পু	লি	■
■	■	■	ফ	জ	লি	■	বে
আ	শা	ব	রী	■	ন	কু	ল

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭২৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ অক্টোবর ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room
—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—
GEETANJALI FURNITURE
Jhaljhalia, Station Road, Malda
Phone : 03512-266063,
Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ধ্যান-তন্ময়তা এবং ত্যাগ কোন মতবাদ নয়, হিন্দু জাতির এগুলি বিশেষত্ব। হিন্দুধর্ম এক মহাসমন্বয়স্বরূপ, সম্প্রদায়বিশেষ নয়, এক আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়, গীর্জা নয়। এই সমন্বয়েরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বৌদ্ধধর্ম।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার অপরূপ মেলবন্ধন

প্রকাশিত হচ্ছে ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা : ১৪২১

● দেবীপ্রসঙ্গ : দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা — **স্বামী অরুণানন্দ**
● দিব্যজীবন : গৌরীমা — **সবুজকলি সেন**

উপন্যাস

● **শেখর সেনগুপ্ত** — তন্ত্রাচার্যের ডায়েরি ● **সুমিত্রা ঘোষ**— জল রংয়ে আঁকা ছবি মুছে যায়
● **সৌমিক ঘোষ**— হীরের আংটি

প্রবন্ধ

● **রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী** — ইসলামে নারীর স্থান : আফজল খাঁ ও ৬৩ জন বিবির হৃদয়বিদারক উপাখ্যান
● **অচিন্ত্য বিশ্বাস** — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চিত্তরঞ্জন সুতারের অবদান ● **তথাগত রায়** — কেন এই ধর্ষণবন্যা?
● **প্রণব চট্টোপাধ্যায়**— সার্ধশতবর্ষে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর : ঐতিহ্য, আধুনিকতা, বিজ্ঞান সাধনা ও স্বদেশ চেতনা
● **রবিরঞ্জন সেন** — হিন্দুত্বের রক্ষক দেবেন্দ্রনাথ ● **সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**— ভারতীয় চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবাদ
● **গোপাল চক্রবর্তী**— কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারের উত্থান ও পতন ● **তুষারকান্তি ঘোষ** — হিন্দুধর্ম ও বর্তমান বিশ্ব
● **অরিন্দম মুখোপাধ্যায়**— বাংলা-ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ● **গোপেশচন্দ্র সরকার**— যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোয় জমান্তরবাদ তত্ত্ব ● **অর্ণব নাগ**— বই বৈ তো নয় ● **সৌমেন নিয়োগী**— আজিবক তীর্থ— বরাবর ও নাগার্জুনই পাহাড়
● **বাসুদেব ধর**— বিপন্ন ঐতিহ্য, বিপন্ন সভ্যতা ● **দেবীপ্রসাদ রায়**— আমাদের সার্বিক অবক্ষয়ের কারণ : জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে ব্যর্থতা।

বিচিত্র রচনা

● **তাপস অধিকারী**— চড়াই তুমি ভালো থেকো ● **সুন্দর মৌলিক** — স্টেশনের কথা।

জীবনকথা

● **বিজয় আঢ্য**— এক অপরাজেয় যোদ্ধা।

গল্প

● **রমানাথ রায়**— শেষ বয়সের গল্প ● **শেখর বসু**— সেকেলে ডাকাতের নীতি ● **গোপালকৃষ্ণ রায়**— ধাই মা
● **জিষ্ণু বসু**— সাদা হাতি কালো মাহুত ● **তপন বন্দ্যোপাধ্যায়**— ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো
● **সৌমিত্র দাশগুপ্ত**— ইয়েসস্যার ● **সুনীল আচার্য**— আর্তদিন ● **মেখলা মিত্র**— ভ্যানিসিং পাউডার।

রম্যরচনা

● **চণ্ডী লাহিড়ী**— নিজের রাজ্য, নিজের বাঙালি।

এছাড়াও অন্যান্য রচনায় সমৃদ্ধ।

সবমিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো
একটি সংরক্ষণযোগ্য পূজা সংখ্যা

সত্বর কপি বুক করুন।। মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।। দাম : ৭০ টাকা।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
15 September - 2014

SURYA
EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from
EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা